নক্ষত্রের রাত

নক্ষত্রের রাত

। মতি নন্দী ।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭
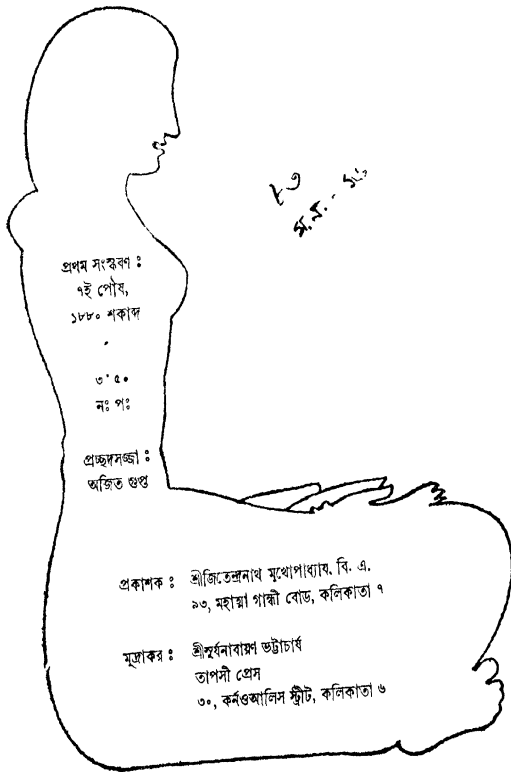
প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই পৌষ,
১৮৮০ শকাব্দ

৩'৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

আমার বুড়ী মা'কে

মানিক-স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতায় 'ধুলো বালির মাটি' নামে বর্তমান উপন্যাসটি **প্রথম পুরস্কার** পেয়েছিল। তাকেই অদল-বদল করে 'নক্ষত্রের রাত' নামে প্রকাশ করা হল।

॥ এক ॥

ছোট ছোট তিনটে শব্দ করে দিনেশের কড়ানাড়ার অভ্যাস। রমা তখন শাড়ি বদলাবার জন্য আটপৌরেখানা আলনা থেকে নামাচ্ছিল, কিন্তু দিনেশের ফেরার শব্দ শুনে ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল। চোখটুকু বার করে অপেক্ষা করতে লাগল কখন মাধবী দরজাটা খুলে দেবে। দরজা কে খুলবে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, কাছে যে থাকে সেই খুলে দেয়। কিন্তু এখন রমার সাধ্যে কুলোল না ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। কে জানে কেমন খবর এনেছে দিনেশ।

ত্বটো লাগোয়া ঘরের সঙ্গে অন্ধকার-অন্ধকার দালানটার একদিকে রান্না-ঘর, আর একদিকে দরজা। দরজাটা পলকা। কড়ানাড়ার সঙ্গে ওর কব্জাগুলোও কাঁপে। তখন বাড়তি আর একটা শব্দ হয়, কিন্তু দিনেশের কড়ানাড়ার মেজাজ এমনই যে বাড়তি শব্দটা আর হয় না। শুধু এইটুকু দিয়েই ওকে চিনে নেওয়া যায়।

কড়া দিনেশ নাড়ছে তাই ব্যস্ত হ'ল না মাধবী। বিছানা থেকে টান দিয়ে পরিষ্কার সুজনিটা তুলে নিল। ছেঁড়া তোশক বেরিয়ে পড়ল। বালিখসা দেয়াল, বাণিসচটা খাট, সিমেন্ট ফাটা মেঝে, নড়বড়ে একটা চেয়ার আর টেবিল, ঝাপসা গোটাকতক ছবি, এসবের মধ্যে পরিষ্কার সুজনিটা বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। মাননীয় বিদেশী অতিথিদের চোখ থেকে শহরের ময়লা এলাকা ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টারই একটা ছোট ধরণের উৎসাহ যেন এতক্ষণ ছিল। সুজনিটা তুলে নেওয়ায় ঘরটা স্বাভাবিক হল।

আর একবার কড়া নড়ল। নড়ুক। মাধবী ভাঁজ করতে শুরু করল সুজনীটা। পাশের ঘরে রমা আছে, খুলে দেবে। খাটের তলা থেকে ময়লা জামাকাপড়গুলো বার করে দড়ির আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ তার মনে হল, দিনেশ যেন অন্যবারের তুলনায় শিগ্‌গির ফিরে এসেছে। এত

তাড়াতাড়ি কি কথাবলা শেষ হয়ে গেল, না কথা না-বলেই শুধু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল !

মাধবী দরজা খুলল। খিল খোলার শব্দে একবার শুধু কেঁপে উঠল রমা।

—কি বলল ?

দিনেশকে ঢুকতে না দিয়ে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় মাধবী জিগ্যেস করল।

—বলেছিলে তো ?

—হ্যাঁ। বলল পরে জানাবে।

কথাটা বলেই দিনেশ ঢুকতে চাইল। মাধবী নড়ল না।

—হাবভাব দেখে কি মনে হল, পছন্দ ?

—কি জানি।

—দেনা পাওনার কথা বলল কিছু ?

—না।

—তাহলে কি করলে এতক্ষণ !

মাধবী সরে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে দিনেশ ওর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল। যেন সব দোষটুকু তারই। মাধবী তাকিয়ে আছে। ঘেন্না করছে। তাকে অপদার্থ ভাবছে। মিষ্টি কথায় পাত্রপক্ষের মন ভেজাতে না পারলে, কাজ বাগাতে না পারলে তাকে অপদার্থ ভাবতে মাধবীর একটুও দ্বিধা হবে না। ও এমন ধরনের মেয়েমানুষ।

কাঁধের হাড়গোড়ের মাঝে দিনেশের মাথাটা যেন আর একটু বসে গেল। দিনে দিনে ক্রমশ সে ছোট হয়ে আসছে।

আটাশ বছর আগের বিয়ের ছবিটা এখনো দেয়ালে ঝুলছে। দিনেশের পরিষ্কার মনে আছে কোথায় তোলা হয়েছিল ছবিটা। বিয়ের পর দিন রওনা হবার আগে, মাধবীর বাপের বাড়ির পাশের বাড়ির উঠোনে জোড়ে ছবিটা তোলা হয়েছিল। ওর অনেকগুলো কপি মাধবীর বাবা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিলি করেছিল। কেউ কেউ নিজেদের ঘরে বাঁধিয়েও রেখেছিল। এখন, আটাশ বছর বয়সী কাঁচের ঐধার থেকে

ছবিটা, যে কোন দম্পতির নামে খবরের কাগজে ছাপা যেতে পারে। এত ঝাপসা!

মাঝে মাঝে দিনেশ ভাবত কাচটা পরিষ্কার করে দেবে। দেওয়া হয়নি। কেমন আলসেমিতে ধরে। এতে তার কি লাভ হবে। ছেলে-মেয়েরা অবাক হবে শুধু, তাদের বাবার জোয়ান বয়সের চেহারা দেখে। রীতিমত সাঁতার-কাটা স্বাস্থ্য। এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না। না করলে কিছু লোকসান নেই। ছবিটার আজ কোন ধরনেরই মূল্য নেই। যে জিনিসের থাকা না-থাকা সমান, তার সম্পর্কে আলসেমি আসা স্বাভাবিক।

আজ কতদিন পরে ছবিটা যে ঘরে আছে, সে খেয়াল হল। চেয়ারে বসে দিনেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ছবিটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। ওটার কোন অর্থ নেই। এমন একটা অর্থহীন জিনিস যে এতদিন মাধবীর নজরে পড়েনি, এইটেই আশ্চর্যের। লাভ লোকসান না খতিয়ে তো মাধবী চলে না। যারা খতিয়ে চলে তারা বোধহয় এর মাঝামাঝিগুলোকে আমল দেয় না। আমাকেও ও আমল দেয় না। আমি লাভ লোকসান মেপে চলি না, চললে বোধহয় আরো চালাক চতুর হতে পারতুম; সংসারের এই হাল হত না। উৎসাহ থাকলে চালাক হওয়া যায়। মহিম আজ নিজের বাড়িতে অফিস করেছে, বাড়ির সামনে মোটরের ভিড় জমে। অথচ ও স্কুলে কি বোকাটাই না ছিল! স্কুল ছাড়লুম একসঙ্গেই প্রায়। আমি চাকরিতে ঢুকলুম, আর ও জ্যোতিষী মামার সাগরেদি শুরু করল। মহিমের সব-কিছুতেই উৎসাহ ছিল। আজও আছে। আজও আগের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে, সাংসারিক পরামর্শ দেয়, আর সে পরামর্শ শুনলে লাভ ছাড়া লোকসান যে হবে না, তাই বোঝাতে নিজের দিকে আঙুল দেখায়। গল্পের মত শুনতে লাগে। নতুন টাকা আর আংটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেও বেশ লাগে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাইরে এসেই ভুলে যাই। কি হবে মনে বড় নোংরা। তার থেকে অনেক ভাল চ

রমা বুঝল এতক্ষণ বই পড়

—বেশ লাগছে পড়তে।

—ওতো তোমার কতবার পড়া বই।

বিবেকানন্দের চিঠি। কয়েক পাতা উলটিয়ে আর একটা তুলল। শরৎ গ্রন্থাবলী। মনযোগ করল।

এখন রাগ করে কোন লাভ নেই তবু রাগ হল মাধবীর। দিনেশের দোষ নেই। তারা যদি রমাকে না পছন্দ করে তাহলে কি-ই বা সে করতে পারে। কিন্তু একটা কিছু তো করা উচিত। মুখ বুঁজে বই পড়লেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। কিছু না পারুক অন্তত ভাবুক। চেঁচিয়ে সেই ভাবনার কথাটা জানাক। যত ভাবনা একাই ভেবে মরব ; ওর কি কোন দায় দায়িত্ব নেই। সংসার খরচের কটা টাকা ফেলে দিয়েই খালাস! ঘাড় গুঁজে বই পড়ছে কেমন নিশ্চিন্তে। এতবড় যে একটা বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে সে খেয়াল নেই। অন্যের ভাবনা বইয়ে লেখা আছে। তাইতে ডুবে গেছে। অন্যের ভাবনা ভেবে কি লাভ!

মাধবী শব্দ করে দরজায় খিল দিল।

সেই শব্দে আর একবার কেঁপে উঠল রমা। চোখ বুজে এল। এবারেও তাকে অপছন্দ করেছে। এই নিয়ে দু'বার হল। লজ্জা করছে। সেজে-গুজে কতকগুলো অপরিচিত লোকের সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকা। বাঁধা মামুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আর মায়ের রাগ দেখা। এত করেও কিছু হল না। আমার জন্যই মা রাগে, বাবা মাথা গুঁজে বই পড়ে। এখনকার এই মনকষাকষি, অশান্তি আমার জন্যেই। আমায় অপছন্দ করেছে, তার মানে ওদের চোখে আমি কুচ্ছিত। নিজেকে কুচ্ছিত ভাবতে লজ্জা করে। এখবর পাঁচজনে শুনলে নানান কথা বলবে, দয়ার কথা।

আয়নার সামনে দাঁড়াল রমা। জায়গায় জায়গায় পারা উঠে শুকনো পোড়া ঘায়ের মত দাগ ধরে আছে। খোঁপায় আঙুল চেপে কাঁটাগুলো বসিয়ে দিল। আয়নার আধখানা কাঁচ অদ্ভুত। মুখটা লম্বাটে দেখায়। দেখলে জোড়ে রে। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ঘরে টাঙানো কপি মাধবীর বাবা আত্মীয়স্বজনদের বিলিয়ে বিলি করেছিল। কেউ কেউ নিজেদের ঘরে বাঁধিয়েও রেখেছিল। এখন, আটাশ বছর বয়সী কাঁচের ঐধার থেকে

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোচ্ছিল রমা। আরো বিরক্ত গলায় মাধবী বলল—

—কাপড়টা ছাড়বি কখন ?

খেয়াল হল রমার। কাপড়টা আগেই তুলে রাখা উচিত ছিল। লোক-জনের সামনে বেরোবার মত এই একখানাই শাড়ি আছে। যদি দাগ ধরে বা ছেঁড়ে! এবার গলার স্বর ইচ্ছে করেই চড়িয়ে মাধবী বলল।

—বাহার দেওয়া হচ্ছে। যেন হাজার গণ্ডা শাড়ি কিনে দিয়েছে। তোলাগুলো পরে পরে আর একখানাও তো আস্ত নেই।

—এই একখানাই তো তোলা শাড়ি! আর ছিল নাকি ?

—থাকবে কি করে ? আমার বাপ তো তোর বাপের মত নয়, তোরঙ্গ ভর্তি করে শাড়ি দিয়েছিল। দিতে জানা চাই, বুঝলি—

মাধবী এই যে শুরু করল, যতক্ষণ না দিনেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে আর থামবে না। প্রতিদিনের ঘটনা। একটা ছুতো পেলেই হয়। রমা তাড়াতাড়ি বদলে নিল শাড়ি। তোরঙ্গের শেষ তলাতে পাট করে বিছিয়ে রাখতে হবে। রমার হাত থেকে মাধবী সে কাজটুকু তুলে নিল।

পাশের ঘরে এসে রমা ঢুকল। দিনেশ বেরিয়ে যায়নি। ছুটির দিন আজ। বিকেলের আলোও যাই যাই শুরু করেছে। জানলা থেকে টেবিল পর্যন্ত শুধু স্পষ্ট নজর করা যায়। নয়তো চোখ টান করে বাকি ঘরটুকুতে তাকাতে হয়।

মাথা ঝুঁকিয়ে বই পড়ছে দিনেশ। মাধবীর কথাগুলো নিশ্চয় কানে গেছে।

—বাবা, বাইরে যাবে না ?

নরম গলায় বলল রমা। কিন্তু তাই বলে এত নরম নয় যে উত্তর পাওয়া যাবে না।

—বিকেল হয়ে গেছে। একটু ঘুরে এসো।

এবার পাশে দাঁড়িয়ে রমা বলল। একটু বেশি রকমের চমকাল দিনেশ। রমা বুঝল এতক্ষণ বই পড়ছিল না।

—বেশ লাগছে পড়তে।

—ওতো তোমার কতবার পড়া বই।

—তবু বেশ লাগে। এক একবার, এক একরকম লাগে।

হাসল দিনেশ। বড় ঠাণ্ডা হাসি। রমার কষ্ট লাগে এই ছোটখাট মানুষটার জন্য। কটুকাটব্যগুলো নির্বিবাদে হজম করেও হাসতে পারে। তখন চোখে চোখ রাখলে মন জুড়োয়। মন খারাপও হয়। হাসির কথায় হাসে না। হাসবেই বা কোত্থেকে। সংসারে হাসির কথা হয় নাকি!

দিনেশ তাকিয়ে আছে। ঘরের আলো এখন অনেক কম। তবু মুখের দিকে তাকান যায় না। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে চোখ দুটো। চোখ সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রমা।

দরজা পেরোলেই সরু একফালি জায়গা। একধারে ওপরে যাবার সিঁড়ি। আর একধারে উঠোন। সিমেণ্টের রক উঠোন ঘিরে। রকের ধারে আর দুটো ঘর। যমুনারা থাকে।

উঠোনের একধারে কলতলা। বাইরে আর ভেতরে দুটো চৌবাচ্চা পুরুষ আর মেয়েদের জন্য। মেয়েদেরটা পাঁচিলঘেরা টিনের চালা দেওয়া। বাসন মাজার কাজে বাইরেরটার ব্যবহার হয়। কাপগুলো ধুয়ে যমুনার দরজায় এসে রমা দাঁড়াল।

চুল বাঁধছিল যমুনা। ভেতরে ডাকল সে রমাকে। ছিমছাম থাকতে যমুনা ভালবাসে। ছেলেপুলে হয়নি। সে আর স্বামী। স্বামীর রোজগার ভাল। খাট, পুরু গদী, আয়না লাগান আলমারি, ঘেরাটোপে ঢাকা সুটকেশ, সবকিছুই এবাড়ির অন্যদের থেকে সিজিল-মিছিল। নিজেকেও যমুনা সাজগোজে অন্যদের থেকে তফাত করে রাখে। আজ তিন বছর আছে, তবু কেউ মন খুলে ওর সঙ্গে মিশতে পারল না।

মাধবী যমুনাকে পছন্দ করে না। কিন্তু মুখে তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। ওর ঘরে রমার যাওয়া সে একদম পছন্দ করে না। কিন্তু মুখ ফুটে বারণও করেনি। যমুনার গ্রামাফোন আছে। গানগুলো রমার মুখস্থ। গুন-গুনিয়ে দু'একটা কলিতে সুর তুললেই কপালে ভাঁজ ফেলে মাধবী তাকায়। রমার গান থেমে যায়। দু'একবার চুলবেঁধে দিয়েছিল যমুনা নতুন কায়দায়। মাধবী অবাক চোখে তাকিয়েছিল খোঁপার দিকে। রমা আর চুল বাঁধেনি যমুনার কাছে। সিনেমা দেখে এসে গল্প বলে যমুনা। এমন করে বলে যেন

চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে রমার। কিন্তু মুখ-ফুটে মাধবীকে বলতে সঙ্কোচ হয়।

রমা বোঝে যমুনার স্বচ্ছল অবস্থাকে সহ্য করতে পারে না মাধবী। তাই রাগ উসকে ওঠে। কিন্তু দায়ে-অদায়ে, টুকিটাকি সাহায্যের জন্য হাত পাততে হয়। রাগ আর অনুগ্রহ চাওয়া, এই দু'য়ে মিলে মাধবী শুধু ভদ্র সম্পর্ক-টুকুই রাখতে চায়। আর যতটুকু ঘনিষ্ঠ হলে এই সম্পর্ক বজায় থাকে, তার বেশিতেই মাধবীর শাসন। তাই দরকার না পড়লে যমুনার ঘরে আসার উপায় নেই।

—কি, বলে গেল কিছু?

ফিতেটাকে দাঁতে চেপে আয়নায় চোখ রেখে যমুনা জিগ্যেস করল। রমা হাসল। কাপগুলো সাজিয়ে রাখল তাকে। ফিরে দাঁড়াল যমুনা।

—নাকি এবারেও সেই আগের মতন। পরে চিঠি দিয়ে জানাব!

মাথা নাড়ল রমা। তাতে হ্যাঁ এবং না দুই-ই বোঝায়। যমুনা কি বুঝে শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। রমা দরজার দিকে তাকাল। অস্বস্তি ভোগ করার আগেই সে চলে যেতে চায়।

—যাই বৌদি। কাজ পড়ে আছে।

—উনি বলছিলেন চুঁচড়ো না কোথায় যেন একটা মেয়ে জলে ডুবে মরেছে।

—কেন!

—বাপ-মাকে রেহাই দেবার জন্য। এখনো এসব হয়।

—যাই বৌদি।

—আমার বেলায় হয়েছিল কি, যারাই দেখেছে পছন্দ করেছে। কিন্তু বাবার এক গোঁ, কারুর খাঁই মেটাব না। মেয়েতো কুচ্ছিত নয়।

হাসল যমুনা। পানখেয়ে দাঁতগুলোকে ফোকলা দেখায় এই অন্ধকার--অন্ধকার আলোতে। নয়তো মুখের গড়ন ভাল।

—তোমার দাদা নিজে এসেছিল আমায় দেখতে।

হাতের প্যাঁচে চুলগুলোকে কায়দা করে ফেলল যমুনা। বেশ ঘন চুল। রমা তাকিয়ে রইল চুপ করে।

—পাত্তর নিজে আসে নি ?

—কি জানি।

—আহা, ন্যাকা! দেখলেই তো চেনা যায়।

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রমা। উঠোনের একধার দিয়ে একটা গলি এঁকেবেঁকে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। গলিতে কোন দরজা নেই। তাই উঠোনের কোন আব্রু নেই। বাইরের লোক যে কোন সময় হুট করে এসে পড়তে পারে। নতুন মেয়েরা প্রথমে অস্বস্তিতে ভোগে। ফেরিওয়ালারা একদম উঠোনে এসে হাঁক দেয়। পরিচিত হলে দরজায় এসে দাঁড়ায়।

মাথা নিচু করে সার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিশ্ব আসছিল। গলি আর উঠোনের মুখে পাল্লা-ভাঙা লেটার-বক্সটা দেখতে সে মুখ তুলল। চিঠি আসে নি কিন্তু রমাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ভাঁজ পড়ল তার।

বিব্রত হয়ে চারপাশ তাকাল রমা। বিশ্বর হাসিটা চোখে পড়াব মত। তবু রক্ষে, ধারে কাছে এখন কেউ নেই। উঠোন থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে সুস্থ মানুষের অতখানি সময় নেওয়া চোখে পড়ার মত। রমা আবার যমুনার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিশ্ব আবার সার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, মাথা নিচু করে তার স্বাভাবিক গতিতেই তিন তলায় উঠে গেল। মা আর বিধবা দিদিকে নিয়ে সে থাকে।

—কি ?

—কাবেরী আবার কবে আসবে ?

কাবেরী যমুনার বোন। দিদির কাছে এসে সে মাঝে মাঝে থাকে।

—এই তো ক'দিন আগে গেল, কলেজের ছুটি না পড়লে আর আসবে কি করে।

—তার মানে সেই পুজো ?

—হুঁ। ও বুঝি তোর দাদার একটা গল্পের বই নিয়ে গেছে ?

—কি জানি।

—হ্যাঁ। বলেছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

—আচ্ছা বলব।

চলে যাচ্ছিল রমা। যমুনা ডাকল।

—কে চুল বেঁধে দিয়েছে রে?

—নিজেই।

—আহা বাঁধার কি ছিরি। মাথা ঘষিস নি ক'দিন?

—কাল পরশু ঘষব।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা। দালানে পা দিয়েই মাধবীর গলার স্বর কানে এল।

—দোতলার বড়বৌয়ের ভাইপো। মাস ছ'য়েক হল চাকরিতে ঢুকেছে। বাপের এক ছেলে। বাড়ি আছে। অবস্থা ভাল।

—খরচ পত্তরের কথা বলেছে কিছু?

—আগে মেয়ে দেখুক, তারপর তো কথা হবে। চাকরে ছেলে, খাঁইতো থাকবেই। তোমার চাকরিরই বা আর ক'দিন, এই বেলা দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে না দিলে মুশকিলে পড়তে হবে। শরীর তো দিনকে দিন ভেঙে পড়ছে।

যেমন ভাবে ঢুকেছিল তেমনি চুপিসাড়ে রমা তিনতলার সিঁড়ি ধরল। ওরা কথা বলছে। সংসারের দরকারি কথা। আপাতত ভুলে থাকবে সব কিছু। থাকুক। ততক্ষণে তিনতলাটা চট্ করে ঘুরে আসা যায়। মাধবী খোঁজ করার আগেই। এখন বিকেল। এখন সংসার থেকে একটু ছুটি। খোঁজ করলেই বা, এ সময়টা আমার নিজের। তরতরিয়ে সিঁড়ি ভাঙল রমা। প্রতিটি ধাপই ক্ষওয়া, ভাঙা, পা ফেললেই পড়ে যাবার ভয় আছে। চারটে বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা ছাদে পৌচেছে।

বিশ্বদের দরজাটা খোলা। ঝাঁট দেওয়ার শব্দ আসছে। বিশ্বর দিদি এখন সংসারের কাজে ব্যস্ত। ভালই হয়েছে। দরজাটা এড়িয়ে ছাতে এল রমা।

চারতলা বাড়িটার পাশে একটা বটগাছ। ওই দিকে সূর্য ডুবেছে। গাছের মধ্যে অজস্র আলোর ঘুলঘুলি। কাক নাচানাচি করছে গাছে। কালোকালো মাথা যেন পরের বাড়ির উঠোনে উঁকি দিচ্ছে। তারপর কোথায় কি ঘটল। হুস হুস করে কাকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। দু' একটা রমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

মেয়েরা বেড়াচ্ছে, গল্প করছে ছাতে। ছাতগুলো দূরে দূরে। কথা বলতে হলে চীৎকার করতে হবে। তাছাড়া আলাপও নেই, নিত্যি নতুন ভাড়াটে আসছে-যাচ্ছে। বাড়ি বয়ে ভাব করতে কে যায়! তাছাড়া চাইলেই বাড়ি থেকে বেরোন অত সোজা ব্যাপার নয়। উঠতি বয়সী মেয়ে, হুট হুট করে এবাড়ি সেবাড়ি করবে, সেটা মাধবী পছন্দ করে না।

মেয়ে দুটো হেসে গড়িয়ে পড়ল। আবার ছুটে এল পাঁচিলে। দুখানা বাড়ির পরের ছাতে, চা খাচ্ছে একটা লোক। মুচকে হাসছে। দুটো মেয়েই স্কুলে পড়ে। রমা প্রায় দিন ছয়েক হল লোকটাকে চা খেতে দেখছে।

পাঁচিলে একসার শিশি। গামছা পরে এক মাঝ-বয়সী বৌ ওগুলো তুলছে। দূর থেকে দেখেই দাঁত সিরসির করে। অনেক দূরে আর একটা বাড়িতে বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। আজ সকালেই শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। গায়ে হলুদ হল বোধ হয়।

যতটুকু দেখা যায়, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রমা। ছাতের একধারে গঙ্গার জলের ট্যাঙ্ক। ওপরের ঢাকনিটা অনেকদিন ভেঙেছে। হাত দিলেই ঝুরঝুর করে মরচে খসে পড়ে। তলাটুকু এখনো আস্ত আছে, কাজ চলে যায়।

ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ছাতটা সরু ফালি হয়ে শেষ হয়েছে পাশের বাড়ির দেয়ালে। ফালি জায়গাটুকুতে কতকগুলো কুঁজো ভাঙা টব। ফুলগাছের জন্য তৈরি হয়েছিল। ফুল ফুটতোও। গাঁদা, বেল, দোপাটি। কেমন যেন পাগলাটে ধরনের ছিল মধুসূদনবাবু। মাঝরাতে বৌকে নিয়ে ছাতে আসত। গল্প করত। একটা ভাঙা সেতার ছিল। বাজাত। সারা বাড়ি হাসাহাসি করত। লুকিয়ে অনেকে দেখত ওদের গল্পকরা। বড় ঘরের ছেলে ছিল মধুসূদন। ঠাকুর্দা ঘোড়ায় চেপে গড়ের মাঠে হাওয়া খেত। ওর বাপ জোয়ান বয়সে জুড়ি হাঁকিয়েছে। একদিন মধুসূদন চাকরি থেকে ছাঁটাই হল। সেতারটা বিক্রি করে দিল। আর একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল বস্তিতে। সে ঘরে এল যমুনারা। সকলে বলল, এবার লোকটার পাগলামি ঘুচবে। রোজ টবে জল দিত মধুসূদন। এখন মাটি পাথুরে।

টবগুলো পার হয়ে বিশ্বর জানলার ধারে দাঁড়াল রমা। তিন দিক দেয়াল ঘেরা ছাতের এই ছোট্ট জায়গাটা প্রায় একটা লুকোন ঘরের মত। ভাঙা ট্যাঙ্ক, দেয়াল আর আকাশ।

রমা সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল ঘরে কে! অবশ্য বিশ্ব ছাড়া আর কারুর থাকার কথা নয়। ঘরটা এত ছোট যে ঠাকুরঘর ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না। ওই জন্যই বোধ হয় তৈরি হয়েছিল। এখন ও ঘরে সংসারের একমাত্র পুরুষ বিশ্ব থাকে।

চা খাচ্ছিল বিশ্ব। বিছানাটা একধারে গোটান। তার ওপর ছেড়ে রাখা জামাটা আর বই-খাতা; ভাঁড়ে বিড়ি সিগারেটের টুকরো। দেয়ালে কাত হওয়া সুভাষ বোসের ছবি। ঘরের দরজা বন্ধ।

একচিলতে কপাল জানলা থেকে সরে যেতেই বিশ্ব চায়ের কাপ হাতে উঠে এল।

—খুব সাহস হয়েছে দেখছি। মা বুঝি এখন বাড়ি নেই?

—যাবে কোথায়!

রমা তবু ছাদের দিকে তাকাল। বিকেল হয়েছে। ছাতে কেউ উঠে আসতে পারে। সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ হয় কিনা শোনার জন্য কান পাতল।

—শুনলুম, আজ দেখতে আসার কথা আছে?

—দেখা হয়ে গেছে।

—ও। কি হল?

—পছন্দ হয় নি।

শুকনো স্বরে বলল রমা। চায়ের বাটি মুখের কাছে তুলেও চুমুক দিল না বিশ্ব।

—রোজ একধরনের খোঁপা বাঁধ কেন?

—তাতে কি হয়েছে?

—দেখতে ভাল লাগে না।

—হ্যাঙ্গামা অনেক।

—ও। চা খাবে?

বাটিটা এগিয়ে ধরল বিশ্ব। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে গলবে না বাটি। কাত করে চুমুক দিতে হবে।

—না।

—না কেন?

—ভাল লাগছে না।

—হঠাৎ।

আর কথা বাড়াল না রমা। পুরুষ মানুষের একঘেয়ে অনুরোধ সব সময় ভাল লাগে না। রাজী না হলে বিশ্ব এখন ঘ্যান ঘ্যান করবে।

বাটিটা গরাদের ফাঁকে ধরে চুমুক দিল রমা। চা'টা জুড়িয়ে গেছে। বোধ হয় বিশ্ব বাড়িতে ঢোকার আগেই তৈরি হয়েছিল। জুড়োন চা একদম ভাল লাগে না। এক চুমুক দিয়েই রমা মুখ সরিয়ে নিল।

—আমার এঁটো চা খেলে তো!

এমনি ভাবে প্রথম দিন চা খাওয়ার পর বিশ্ব ভয় দেখিয়েছিল। ঝাঁঝিয়ে উঠে রমা বলেছিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, টি-বি হয়তো আমার হবে, তাতে তোমার কি। ঠাট্টা করতে করতে সত্যি যেদিন হবে, সেদিন বুঝবে।

আজ রমা চুপ। শুধু বিশ্বর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চা-টুকু এক চুমুকে শেষ করল বিশ্ব।

—মন খারাপ বুঝি?

—কেন?

—পছন্দ করেনি বলে।

—তাতে মন খারাপের কি আছে?

আগের বার যখন রমাকে দেখে অপছন্দ করে যায় তখন ঠাট্টা করেছিল বিশ্ব। ঠোঁট উলটিয়ে রমা বলেছিল,—হ্যাঁ, পছন্দ করবে না আর কিছু! কালো কুচ্ছিতকে কে বিয়ে করবে।

—তাহলে মন খারাপ হয়নি। তবে কথা বলছ না যে?

একটু যেন অভিমানী সুর বিশ্বর। কি কথা বলবে ভেবে পেল না রমা। মনের ওপর অসহ্য চাপ পড়েছে। চাপটা সরে গেছে। এখন আছে শ্রান্তি। মন জিরোতে চায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে।

—জানো মা ওঠে পড়ে লেগেছে। এবার গেছে দোতলার জেঠিমার কাছে। ওর কে যেন আছে। ভাল চাকরি করে।

চুপ করে রইল বিশ্ব। সেদিনকার মত ঠাট্টা করে বলল না,—আমিই বা কি এমন বেকার। হা-পিত্যেশ করে জানলার ধারে তাকিয়ে বসে থাকাটাও তো একটা কাজ!

—অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছি।

আপন মনে বিড়বিড়িয়ে কতকগুলো কথা বলে গেল বিশ্ব। তারপর সব কথা ফুরিয়ে গেল।

—সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

—হুঁ।

—উনুন ধরাতে হবে, সন্ধ্যে দেখাতে হবে, চলি।

কথাটা বলেও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রমা। তারপর নিচে নেমে গেল।

দিনেশ একা বই পড়ছে ঘরে। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। আলো জ্বালবার কথাও ভুলে গেছে। সুইচ টিপতেই চোখ খুলল দিনেশ। বই পড়েনি, চোখ বুজিয়ে বসে ছিল।

—মা কোথায়?

—এই তো দোতলায় গেল।

—তুমি বেরোবে না!

—কোথায় যাব?

—র'কে গিয়ে তো বসতে পার।

—ভাল লাগে না।

—তা হলে পার্কে।

—আচ্ছা যাচ্ছি। উনুন ধরেছে?

—চা খাবে তো!

উনুন ধরাবার তোড়জোড় শুরু করল রমা। তোলা উনুনে কয়লা সাজিয়ে, উঠোনে গিয়ে আগুন দিতে হয়। নইলে ধোঁয়ায় ঘরে তিষ্ঠোন যায় না। এ বাড়ির সকলেরই তোলা উনুন।

কাঠ সাজাচ্ছিল রমা। সানু এসে পাশে দাঁড়াল। বিকেল হতে না হতেই সে বেরিয়েছিল বল খেলতে।

—মা কোথায় রে ?

—দোতলায়।

সাবধানে কয়লা ফেলতে ফেলতে রমা বলল। ঘরে ঢুকেই গজগজ করে উঠল সানু।

—আমার ছবিতে কে হাত দিয়েছিল। ছিঁড়ে গেছে।

—কোন্ ছবিটা ?

রাস্তার পোস্টারের একটা ছেঁড়া টুকরো এনে দেখাল সানু। সার্কাসের পোস্টার। একটা সিংহের মুখ, বিকট হাঁ করে আছে।

এটা সানুর বাতিক। পছন্দমত ছবি কোথাও দেখলেই যোগাড় করে এনে ঘরের দেয়ালে সেঁটে রাখবে। ঘরের এক দিকের পুরো দেয়াল, যতটুকুতে তার হাত পৌঁছায়, এখন তার দখলে চলে গেছে। ওর বাতিকে কেউ বাগড়া দেয় না।

দালানে ঝুঁকে পড়ে সানু খোঁজাখুঁজি করে একটা ভাত খুঁটে নিল।

—ফের আবার ওই সব হচ্ছে। আমি কিন্তু মাকে বলে দোব, সিষ্টি এঁটো করেছিস। ঘরে লক্ষ্মী আছে না ?

—আমিও বলে দোব তুই দালান পরিষ্কার করিসনি, সক্‌ড়ি ছিল।

—বলে দেখ্‌না। কে মার খায় দেখব।

কথাগুলোতে কান না দিয়ে সানু ঘরে ঢুকল। ভাত টিপে, ছবিটায় মাখিয়ে দেয়ালে সেঁটে দিল। তেল লেগে ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে মস্ত এক এরোপ্লেন। এইখানে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পান সাজে মাধবী। এরোপ্লেনটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল সে। চুন লেগেছে, মানকড়-পঙ্কজ রায়ের ছবিটায়। খুঁটে ফেলে দিল।

—খালি ছবি আর ছবি! ঘরটাকে কি নোংরা করে রেখেছে। দোব একদিন সব ছিঁড়ে খুড়ে।

দেশলাই নিতে ঘরে ঢুকেছিল রমা। শাসিয়ে উঠল সানুকে। গ্রাহ্য করল না সানু। এমন শাসানি রমার কাছ থেকে দিনে অনেকবার শুনতে হয়।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সান্থর নজর পড়ল ইঁটের ওপর সাজান তোরঙ্গগুলোর তলায়। শালপাতার ঠোঙা উঁকি দিচ্ছে।

দালান থেকে রমা চীৎকার করল।

—চান করে আয় সান্থ। নইলে কিন্তু আজ আর পাশে শুতে দোব না। গা দিয়ে রোজ ঘেমো টোকো গন্ধ বেরোয়।

উনুন নিয়ে রমা বেরিয়ে গেল। ঠোঙাটা টেনে বার করল সান্থ। একটা নিমকি আছে। সেটা বাদ দিয়ে গুঁড়ো গুলো খুঁটে খেতে শুরু করল।

—ওতো চাকরি করে, তবে রেস খেলে কেন?

তখন ফুটপাথের মানুষেরা গভীর ঘুমের দিকে চলেছে। চিনু কথাটা জিগ্যেস করল। পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা দুজন হাঁটছিল। চিনু আর অমল।

—ওর বাড়ির অবস্থাও এমন কিছু খারাপ নয়।

—অবস্থা খারাপ হলেই কি কেউ রেস খেলে?

—তাছাড়া আর কি, শিগ্‌গির টাকা করার ওর চেয়ে সহজ পথ আর কি আছে?

পার্ক থেকে একটা শুকনো কাঠি কুড়িয়ে এনেছিল চিনু। তাই দিয়ে রেলিঙে খড় খড় শব্দ করল। অমল আঙ্গুল দেখাল রাস্তার ঘুমন্ত মানুষদের।

—ওদের তো খুব টাকার দরকার, কই ওদের কজন রেস খেলে?

—ওদের কথা বাদ দে।

—কেন?

—ওদের আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি না।

—মনীষের তো বিশেষ অভাব নেই তবে সে কেন খেলে?

—আমার প্রশ্নটাও তাই।

চুপ করে ওরা হাঁটল। শেষ ট্রিপের বাসগুলো পড়িমরি ছুটছে। বাসে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে মানুষ। নিওনের বিজ্ঞাপনগুলো নিভে গেছে। দোকানের আলো আর রাস্তায় নেই। প্রাইভেট মোটরগুলো চোখ খুলে

ছুট লাগিয়েছে। ঠেলা গাড়িতে আনাজ চলেছে। ভিড়, বাস টার্মিনাসের চায়ের দোকানটায়।

—মনীষটা দারুণ মেজাজী। এক কথায় কেমন দশটাকার খাইয়ে দিল।

—কালকেই তিরিশ টাকা জিতেছে।

—ও কিন্তু প্রায়ই জেতে। খুব হিসেব করে খেলে।

—হ্যাঁ, খেলার সময় হিসেব করে, কিন্তু খরচ করে দুমদাম।

চিনু দাঁড়াল আগুনের দড়িটার কাছে। সিগারেট ধরিয়ে দড়িটা ছেড়ে দিল। ল্যাম্পপোস্টে আছড়ে কতকগুলো ফুলকি হাওয়ায় ছুটে গেল।

—একদিন ওর সঙ্গে মাঠে যাব।

ধোঁয়ায় রিং করার জন্য চিনু আস্তে আস্তে ফুকল। অমল বিরক্ত হয়ে তাকাল। যারা নেশার জন্য সিগারেট খায় তারা রিং করে না। সাঁই সাঁই টান দিয়ে ধোঁয়া গেলে। অমলের এখন গলা শুকিয়ে গেছে ধোঁয়ার জন্য।

—রেসটাও একধরনের খেলা, উত্তেজনা আছে।

—হবে। আমার কোন ধারণা নেই।

গম্ভীর সুরে অমল বলল। বোঝা যায় আলোচনাটা তার ভাল লাগছে না।

—না'হলে বড়লোকরা খেলে কেন?

চিনু জোর টান দিয়ে সিগারেটটা এগিয়ে দিল। আঙুল থেকে তুলে নিল অমল। পরপর কতকগুলো টান দিয়ে ফেলে দিল।

—পরশু যাবি সুভাষদের গ্রামে? অনেকে যাবে। দু'দিন থাকা হবে।

—কত খরচ পড়বে?

—সব মিলিয়ে টাকা দশেকের মধ্যে হয়ে যাবে। চল না, আমিও যাচ্ছি।

—তুই কোত্থেকে টাকার যোগাড় করবি?

—এখন ধার-টার করে ব্যবস্থা করব। পরে শোধ করে দোব।

—তোরা আছিস বেশ। লিখতে জানার এই এক সুবিধে।

—নেহাত বোকা না হলে কোন লেখক উপোসী থাকে না?

হাসল অমল। পকেট থেকে কোঁচাটা ফেলে দিয়ে লাথি মারতে মারতে কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ছুটবি? ওই আলোর থামটা পর্যন্ত।

—পাগল হয়েছিস!

—ছোট্‌ না। রাস্তা তো ফাঁকা। চিকেন রোস্টটাও হজম হবে, একসারসাইজও হবে।

—পুলিশে ধরবে।

—ঘেঁচু করবে।

বলেই ছুট লাগাল অমল। অনেক দূরে গিয়ে থামল। সেখান থেকেই চীৎকার করে ডাকল চিনুকে। জোরে হেঁটে চিনু ওকে ধরল।

—গেঁতো মেরে গেছিস।

—কোন মানে হয় না হঠাৎ এভাবে ছোটার।

—তুই বড় মানে খুঁজিস।

আর কথা বলল না অমল। এবার দুজনের রাস্তা আলাদা হবে। চৌমাথাটায় দাঁড়িয়ে চিনু দেখাল গাড়িবারান্দার তলায় একটা ছোট্ট পরিবারকে, ছেঁড়া কাঁথা, মাটির হাঁড়ি, আর কতকগুলো টিনের কৌটো মাথার কাছে রেখে ওরা ঘুমিয়ে।

—ওই ধারেরটার অবস্থা দেখেছিস। কমাস আগে হয়েছে, আবার হবে।

—ঘুমন্ত মেয়েমানুষের চেহারা বিচ্ছিরি ন্যাদগ্যাদে লাগে।

—দিনের বেলা দেখিস, ট্রাম স্টপেজে বসে ভিক্ষে করে। এই খোলা রাস্তায়, আলো জ্বলছে, লোক চলছে, এরমধ্যেই যে কি করে এই সব হয় ভেবে পাই না।

ছেলেমানুষের মত মুখ করে চিনু ভাবনার সমাধান চাইল যেন অমলের কাছে। মুচকি হেসে ওর পিঠে থাবড়া মেরে বাড়ির পথ ধরল অমল।

তখন খেতে বসেছে রমা, চিনু যখন বাড়ি ঢুকল। রোজকার অভ্যাসমত একবার জিগ্যেস করল, বাবা ঘুমিয়েছে কিনা। হেসে ঘাড় নাড়ল রমা। নিঃশব্দে অন্ধকার ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে, লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে খেতে বসল চিনু।

রোজকার মতই রান্না। মনীষ আজ চিকেন রোস্ট খাইয়েছে, তাই, ক্ষিদে নেই। ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে, থালাটা রমার দিকে ঠেলে উঠে পড়ল।

—খেলে না যে?

—আলুখোসা, কুমড়ো খোসার চচ্চড়ি কি আর রোজ রোজ ভাল লাগে, ও তুই খা।

—যেমন বাজার আসবে তেমনি রাঁধব তো।

—রাঁধতে জানলে ওই দিয়েই রাঁধা যায়।

—একদিন রেঁধে দেখিয়ে দিও না!

চিনুর পাতের তরকারিগুলো নিজের পাতে তুলে নিল রমা।

—ভাতগুলো জল দিয়ে রেখে দে।

অন্ধকার ঘর থেকে হঠাৎ মাধবীর গলা শোনা গেল। এখনো জেগে আছে। চিনু পান খাবার জন্য ও ঘরে আর ঢুকল না। আলো না জ্বেলে দিনেশের খাটের ধারে মেঝেয় পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রমা শুতে যাবার আগে চিনুকে পান দিয়ে এল। তখনও সে জেগে।

॥ দুই ॥

—ওরা এসেছে।

কড়া নাড়ার শব্দ হতেই মাধবী ছুটে এল। পাউডার পাফটা গালে কপালে ঘষছিল রমা। অনেকদিন আগেই পাউডার ফুরিয়েছে, তবু যতটুকু পাফে লেগেছিল তাই ঘষে ঘষে মাখছিল। মাধবীর গলার স্বরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ।

—ওরা এসে গেছে।

চাপা সুরে আর একবার কথাটা বলেই দরজা খুলতে চলে গেল মাধবী। ঘরের দরজা ঘেঁষে, শুধু চোখটুকু বার করে দাঁড়াল রমা।

মোটাসোটা এক গিন্নী। চওড়া কস্তাপাড় শাড়ী, গয়নার থেকেও পান চিবানোর ধরনই বুঝিয়ে দেয় তার অবস্থা স্বচ্ছল। স্বচ্ছল মনে হবার আর

একটা কারণ রমার মনে হল, চটি পরে হাঁটার ঢঙটুকুতে। মাধবীর থেকে বয়সে কিছু বড়ই হবে, কিন্তু মাধবী কি চটি পরে অমন নিঃশব্দে হাঁটতে পারবে! গায়ে গতরে ভারী শরীর নিয়ে একমাত্র স্বচ্ছল মানুষেরাই অমন করে হাঁটতে পারে। তাছাড়া খাটিয়ে মেয়েমানুষের গোড়ালি অমন খোসা ছাড়ান আলুর মত হয় না। ওই গিন্নীর পাশে মাধবীকে বিশ্রী লাগল রমার, কিন্তু বুলাকে তার ভাল লাগল।

সংসারে এমন এক আধটা মানুষ আছে যাদের দেখলেই ভাল লেগে যায়। মধুসূদনবাবুকে লাগত। মানুষটা কেমন কেমন যেন ছিল, সরু সিঁড়িতে মেয়েদের মুখোমুখি হলেই হুড়মুড়িয়ে নেমে গিয়ে পথ করে দিত, সারা বাড়ি এই নিয়ে হাসাহাসি করত, রমা হাসত না। অনেকদিন আগে একটা বুড়ো চিনেবাদামওলা আসত, অদ্ভুত সুরে চিনাবাদাম বলে হাঁক দিত, ছোট বেলায় বাবা যেমন করে ডাকত মাথা টিপে দেবার জন্যে! রোজ বিকেলে চিনেবাদামওলার গলার স্বর শুনতে ভাল লাগত। ওর কাছ থেকে বাদাম কেনার জন্য, অফিস যাবার সময় দিনেশের কাছে দুটো পয়সার জন্য বায়না করতেও ভাল লাগত। বাদামওলাটা একদিন দেশে গিয়ে আর ফেরেনি।

মাধবী ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল, সঙ্গে দোতলার জেঠিমা অর্থাৎ বড় বৌও আছে। বুলাকে দেখে ভাল লাগল রমার। মুখখানি ঢলঢলে, মিষ্টি মিষ্টি। বড় বৌয়ের কাছ থেকে ওর কথা সে অনেক শুনেছে, এখন কথাগুলো সত্যি বলে মনে হচ্ছে। অথচ যমুনার কথামত তার ছোট বোনকে মনে হয়নি। সংসারে এমন মানুষও আছে যাদের দেখলেই মন খিঁচড়ে যায়। কাবেরী সেই ধরনের মানুষ। কদিনের জন্য দিদির কাছে এসে পাড়ার সব-বাড়ির কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর খবর জেনে নিয়েছিল। চিনু ঘুর ঘুর করত যমুনার ঘরের সামনে। আর একটা লোক বড় বৌয়ের স্বামী, দেখলেই একগাল হেসে ঘাড়ে হাত রাখবে। লোকটা দিনেশের বয়সী, তবু হাতটাকে নোংরা লাগে।

ওঘর থেকে কথার শব্দ আসছে। কে কথা বলছে বোঝা যাচ্ছে না। দালানে বেরিয়ে এসে কান পাতল রমা। বুলার মা কথা বলছে, চুরি চামারি

করার জন্য চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর সে মাসকাবারি দোকান থেকে আধ মন চাল নিয়ে সটকান দিয়েছে। শুনতে ভাল লাগছে রমার। বুলাকে নিজের হাতে ঘরের কাজ করতে হয় না, চাকর আছে। জেঠিমা বলেছিল, পড়াশুনোয় বুলা খুব ভাল, হপ্তায় তিনদিন মাস্টার আসে, সামনের বার সে বি-এ পরীক্ষা দেবে। সংসারের কাজ শেখার ফুরসত কোথায়! শুনে অবাক লেগেছিল। দেখতে ইচ্ছে করেছিল বুলাকে। কে যেন কথা বলল, বুলা-ই বোধহয়, মেয়ে দেখতে চাইছে। রমার মনে পড়ে গেল, এখনো তার খাবার সাজানো হয়নি। এখনি তো মাধবী আসবে তাকে নিয়ে যেতে।

মাধবীর ইচ্ছে মেয়ে দেখবার আগে মিষ্টিমুখটুকু করিয়ে দিতে। এর আগে মেয়ে দেখবার পর রমাই খাবার নিয়ে আসত। এবার মাধবীর ইচ্ছেটা বদলে গেছে। কেননা, ঠকতে ঠকতে সে এটুকু শিখে নিয়েছে, আগে মানুষকে যাহোক ক'রে ঋণী করে ফেলতে পারলে সে অনেক কিছু বিবেচনা করে দেখতে রাজী হয়। তাই সে অনুরোধ করেছিল যাহোক কিছু মুখে দেবার জন্য। বুলা আর তার মা একসঙ্গে না না করে উঠল। তখুনি মাধবী বুঝে নিল এরাও ঠেকে শিখেছে, ভালকরে না বাজিয়ে কাউকে ঘরে তোলার কথা বিবেচনা করতে বিন্দুমাত্রও রাজী নয়। এদের রাজী করতে হলে বুদ্ধি খাটিয়ে লড়তে হবে। মনটাকে একটু খানির জন্যেও ঢিলে দিলে চলবে না।

মাধবী খুঁটিয়ে দেখে নিল ওদের। মেয়েটির মুখের গড়ন ভালো হলেও, হাঁ-টা বড়। কথা বলবার সময় মাড়িসুদ্ধ বেরিয়ে আসে। কাঁধটা সরু, হাতের কোন ছিরিছাঁদ নেই। কথাগুলো কেমন কাঠ-কাঠ, আর স্পষ্ট উচ্চারণের। রমার পাশে ওকে তুলনা করা যায় না। মাধবী মনে মনে অনেকখানি স্বস্তি পেল। কিন্তু মেয়ে পছন্দ করার আসল মালিক বুলা নয়, তার মা। মা-টিকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবু মাধবীর মনে হল যেন সে বুঝে ফেলেছে খানিকটা। হাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে বসার ভঙ্গিটি মৃত্যুঞ্জয়ের পিসীর মত। পিসী বিধবা হবার পর ভাইপোর সংসারেই আছে, দিনরাত হেঁসেলেই কাটে, দুপুর বেলাটায় অমন ক'রে ব'সে গল্প করে। রুপোর পানের বাটাটা কোলের মধ্যে যেমন আগলে নিয়ে বসেছে, তাতে যমুনাকে

মনে পড়ল মাধবীর। কোথাও যাবার আগে সাজগোজ দেখাতে আসে যমুনা; তখন ব্যাগটাকে অমন করে কোলে আঁকড়ে রাখে।

চেনাশুনো মানুষকে মনে পড়েছে মাধবীর, কিন্তু তবু গিন্নীটিকে পুরো চেনা হচ্ছে না। বুলার বাবা রেলে ভাল চাকরী করত। কাঁচা পয়সা করেছে, বাড়ী করেছে। মেয়ে বৌকে দেখে মনে হয় পয়সা খরচও করেছে। মাধবীর কাছে তারা হেঁয়ালি যারা আজে বাজে জিনিসে পয়সা খরচ করে। কি দরকার বুলার লেখাপড়ার জন্য পয়সা খরচ করে, ওই রোগা মেয়ে কি চাকরী করে সংসার প্রতিপালন করবে, না করার কোনদিন দরকার ঘটবে। পয়সা আছে, ভাল ঘর-বরে পড়বে। কি দরকার পানের বাটাটা রুপোর করার, পেতলেও তো কাজ চলে যায়। এই বাড়তি খরচ করে যারা তাদের সত্যিই বুঝতে পারে না মাধবী। ওরা কি বোকা? মাধবী আর একবার স্বস্তি বোধ করল।

—আমার কি খুব মত ছিল নাকি! উনিই বল্লেন, শেষ বয়েসটা গঙ্গার ধারে কাটিয়ে দি, তা'ছাড়া ত্ববেলা মায়ের চরণও দর্শন করা যাবে'খন। ভাবলুম কথাটা মন্দ না, বয়স তো হ'লো, তাছাড়া জায়গাটাও বেশ ফাঁকা ফাঁকা, কোলকাতার অবস্থা যা দিন দিন হয়ে উঠেছে এরপর গরু ভেড়াও আর থাকতে পারবে না। এই সব ভেবে তো মত দিলুম বাড়ি করার। ওমা, ত্বদিন বাস কত্তে না কত্তেই বুঝলুম কি ঝকমারিই না করেছি, তার থেকে কোলকাতায় পঁচানব্বুই টাকা ভাড়ায় বেশ ছিলুম। কথা বলার একটা মানুষ পাওয়া যায় না! এপাশে এক ষোল টাকার ভিজিটওলা ডাক্তার, ওপাশে এক পেন্সনওলা এস. ডি. ও.। গাড়ি নিয়ে ওদের বৌয়েরা তো হরদম কোলকাতা আসছে আর যাচ্ছে, উনি বল্লেন একটা গাড়ি কিনি, আমি বল্লুম, না বাপু অত বড়মানুষি দেখিয়ে আর কাজ নেই।

একটানা বকে যেতে পারে মানুষটা। সরল মানুষেরাই বেশী কথা বলে। যত কুটিল ততই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়। সরল মানুষকে বশ করতে বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। মাধবী সহজ সুরে বলল,—যেখানে চিরটা কাল কাটল, তারাই তো বেশী আপনার জন হয়।

—থাকতে থাকতে ওরাও আপনার জন হয়ে পড়তে পারে।

অপ্রস্তুত বোধ করল মাধবী। কথাটা বুলা না বলে যদি তার মা বলত তাহলে অন্যরকম শোনাত।

—তবু, বাঁধন ছিঁড়তে যেমন, গড়তেও তেমনি দেরি হয়।

—সমান সমান হলে দেরি কেন হবে!

বুলার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল মাধবী। ওর চাউনিটা ফলার মত। খচ্ ক'রে যন্ত্রণা দেয়। বুলার মা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে, ভাবখানা যেন, যত টাকা খরচ করে মেয়েকে গড়ে তুলেছে, সেই টাকা গুলোকে একসঙ্গে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। বিরক্তি লাগছে মাধবীর, কিন্তু বিরক্তি জানাবার উপায় নেই। ওদের কথায় সায় দিয়ে চলতে হবে এখন। চলতে হবে রমার মুখ চেয়ে। রমার উপরেও তার বিরক্তি হচ্ছে, ওর জন্যই তাকে মুখ বুজিয়ে ওদের কথা মেনে নিতে হবে।

গোড়ায় সে ভেবেছিল বুদ্ধি দিয়ে লড়তে হবে, আসলে এটা লড়াই করার মত কোন ব্যাপারই নয়, কেননা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লড়াই চলতে পারে না। ওদের কথায় বার্তায়, মন থেকে যে কথাগুলো উঠে আসছে তা' বলার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে। ওরা জবরদস্তি না করলেও জুলুম করছে। অবস্থা বিশেষে মানুষ কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে যায়, ওরাও পেয়ে গেছে। এমন সুবিধে মাধবী জীবনে একবারও পায়নি, পাবে কিনা সন্দেহ আছে। দিনেশ গোবেচারা, ওর উপর জুলুম করে লাভ নেই। শক্ত কথা বললে মাথা নামিয়ে থাকে। একতরফা ঝগড়ায় লাভ নেই। মেয়েটা খুব সহজেই বলল, সমান সমান হলে দেরি হবে কেন। সমান হওয়া যেন মুখের কথা। ওরা যেন ইচ্ছে করলেই সমান হবে। দিনেশ কি ইচ্ছে করলেই তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে? এক একটা মানুষ এক এক ধাতের হয়।

—আমিই ওনাকে বল্লুম, লেখাপড়া জানা বৌ নিয়ে কি হবে। দেখেছিতো, ঘর-সংসার শ্বশুর-শাশুড়ী ফেলে হুট্ হুট্ করে এখান সেখান করে বেড়ায়। তাছাড়া মেয়েরও তো বিয়ে দিতে হবে, তখন লেখাপড়া জানা বৌ কি আর আমার সঙ্গে বসে গপ্পো করবে। তারচেয়ে, ভালো ঘরের নরম সরম মেয়ে আমাদের উপযুক্ত।

—হ্যাঁ, খোকার বৌকে তো আর চাকরি করতে হবে না।

বড়বৌ এতক্ষণ পরে কথা বলল। ও আবার বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। গোটা বাড়িটার কেউই বোধহয় পারে না, দিনেশ ছাড়া। মাধবীর চোখে পড়ল বুলা ঘড়ি দেখছে। ও ঘরে রমা কি করছে কে জানে। এরাতো কিছুই খাবে না বলছে। মিছিমিছি খাবার কিনে পয়সাগুলো নষ্ট হল।

—খোকার অফিসের পরীক্ষা। পাশ করলেই অফিসার হবে। বলছিল এখন বিয়ে করবে না। এখন বিয়ে করবে নাতো কি চুল পাকলে করবে! আর বিয়ে করলে পর পরীক্ষার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয় নি কোনদিন, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। সেদিন একজনরা ফটো পাঠিয়েছিল মেয়ের। খোকাকে দেখাতে গেলুম, বলল ওসব তোমরা দেখ, আমি কিছু জানি না। ওনার খুব পছন্দ হয়েছিল। আমার আর বুলার হয়নি, কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব।

বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মাধবীর। স্বামী, পুত্র, পরিবারের উপর অগাধ কর্তৃত্বের গর্বে টসটস করছে বুলার মা। সংসার মাধবীরও আছে, কিন্তু কোথাও গিয়ে এমন করে বলার সুযোগ তার হবে না। সংসার তাকে বাইরে বলার মত কিছু দেয়নি। সে ভেবেছিল বুদ্ধি দিয়ে লড়বে, ওদের বশ করবে। কিন্তু আক্রমণটা এমন দিক দিয়ে এল, যেখানে কিছুই করার নেই। সংসার তাকে একটা হাতিয়ারও দেয় নি। মাধবী বুঝতে পারে তার হার হয়েছে। লজ্জায় সারা গা জ্বলছে। এখন কিছুই করার নেই। যদি ওদের দয়া হয় তাহলে মেয়ে পছন্দ করবে।

—তাহলে মেয়েকে আনি।

—বেশি সাজগোজ করাবেন না কিন্তু।

সকলেই হাসল বুলার মার কথায়। বড়বৌ শুধু বলল,

—না তার দরকার হবে না।

খাবার সাজিয়ে বসে ছিল রমা। মাধবী ঢুকেই তাড়া দিল। এর মধ্যেই মুখটা চিটচিটে হয়ে গেছে। কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে পাফটা আর একবার ঘষলো। আয়নায় চট করে দেখে নিল কাজলের টিপটা ধেবড়েছে কিনা।

ঘর থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল, প্রথম আলাপে কাবেরী তাকে হাত তুলে নমস্কার করেছিল।

—বুলাকে নমস্কার করবো তো ?

ঘাড় নাড়ল মাধবী। আটাশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। এমনি করেই ঘাড় নেড়ে মা বলেছিল, হ্যাঁ, নামের আগে কুমারী বলবি আর সবাইকে প্রণাম ক'রে সবশেষে আমায় করবি। রমাকে এসব বলার দরকার নেই, এই প্রথম ওকে দেখতে আসছে না। মাধবীকে একবারই সেজেগুজে নিজেকে দেখাতে হয়েছিল। মা, বৌদি বলেছিল মেয়ের পয় আছে। মা কবে মরে গেছে, বৌদি বিধবা হবার পর আর আসেনি।

রমার চুল টেনে কান দুটো ঢেকে দিল মাধবী। তাদের সময় এমন কান-ঝার করা চুল বাঁধার ফ্যাসান ছিল না। আলতা দেয়নি পায়ে, এর আগেও কোনবার দেয়নি। শুভ কাজেই আলতা পরে। আলতায় লক্ষ্মীছিরি আসে। রমার পায়ের পাতা খুঁটিয়ে দেখল সে। খড়ম পা। নখ কাটেনি অনেকদিন। এখন আর কাটার সময় নেই।

—পা ঢেকে বসবি।

ঘাড় নাড়ল রমা। কোনবার মাধবী পা ঢাকবার কথা বলে নি। তাই নিজের পায়ের দিকে তাকাল। থ্যাবড়া, বেঁটে আঙুলগুলো, গোড়ালীটা চিড় খেয়ে ফেটে গেছে। বোকার মত মাধবীর মুখের দিকে তাকাল সে। আলতা পরে নি ভালই করেছে, তাহলেই ওদের নজর টানত। মাধবী নিঃশ্বাস ফেলল জোরে। আজকাল আর কেউ লক্ষ্য করে না শুভ আচার নিয়মগুলো মানা হচ্ছে কিনা। ভালোই হয়েছে।

—চল্।

বুলার হকচকানি ভাবটুকু দেখে মজা লাগল রমার। খুব যেন অবাক কাণ্ড ঘটেছে। কাবেরী যখন নমস্কার করেছিল, তখন কেমন যেন অস্বস্তি লেগেছিল, কিন্তু অমন তাড়াহুড়ো করে সে বুকের কাছে হাতদুটো মুঠো করেনি। আঙুলগুলো সরু, কড়ে আঙুলের নখ রঙ করা। তাছাড়া আর সবই তো মেয়েলি।

—বসুন।

বুলা সরে ব'সে খাটের একধারে জায়গা করে দিল রমার জন্য।

—বোসো।

বুলার মা বলল। খুশি হল মাধবী। সভ্যতা ভদ্রতায় রমা পাশ করা মেয়েদের থেকে কম নয়। মনের মধ্যে জ্বলুনিটা কমে এল। ভরসা আসছে, সাহস দিচ্ছে মনটা। নয়, অপছন্দ করল, তবু আড়ালে ওরা রমার নিন্দে করতে পারবে না। মেয়েরও না, মায়েরও না। সংসারের খাটাখাটনিতে রঙটা ময়লা হয়ে গেছে, নয়তো এত কালো রমা ছিল না। কালকেই ব্যাসম মাখিয়ে মুখটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নরম গলায় মাধবী বলল।

—ভালো করে উঠে বোস।

কাপড়ে পা ঢেকে বসল রমা। সকলে এখন তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কেউ কথা বলছে না। এর আগের বারগুলোতেও এমনি হয়েছে। এই সময়টুকুই ভীষণ খারাপ লাগে। মানুষগুলো মনে মনে তখন তার সম্বন্ধে কি ভাবে কে জানে। এই একটু সময়ের ভালো লাগা মন্দ লাগা দিয়েই তো পছন্দ-অপছন্দের বিচার হবে। কিন্তু পছন্দ করুক আর নাই করুক, সকলে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে ভালোমন্দ যাহোক কিছু একটা ভাবছে, তাই ভাবলেই তো বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ভার ভার ঠেকে। বিচ্ছিরি লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ে। রাগ ধরে নিজের ওপর, সকলের ওপর। প্রাণপণ ইচ্ছে হয় চীৎকার ক'রে, লণ্ডভণ্ড ক'রে ছুটে বেরিয়ে যেতে, অন্ধকার সিঁড়ির কোণে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদতে। কিন্তু ইচ্ছেটা যেমন ঝট করে হয় তেমনি ভাবেই চলে যায়। পরে আর কিছু মনেই থাকে না। কাবেরীকে দেখে মনে হয়েছিল ঠিকমত লেখাপড়া করলে এতদিনে বি-এ পাশ করে যেতুম। ইচ্ছে হয়েছিল বইপত্তর নিয়ে লেখাপড়া শুরু করতে। ইচ্ছেটা দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিল। তারপর কাজের ঝঞ্ঝাটে কি যে হয়ে গেল! এমন কত ইচ্ছে সারাদিনে মনের মধ্যে তৈরী হয়, সব কি পূরণ করা যায়! এখন যদি জানা যেত বুলা তার সম্বন্ধে কি ভাবছে।

রমার নাকের ডগা ঘেমে উঠল, কানের গোড়া গরম লাগছে। আর আশ্চর্য, ক্ষিদে পাচ্ছে। শরীরের ভেতরটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে চাইছে, টান ধরছে, আঙুল কাঁপছে। আগুনের মত গরম চা যদি খাওয়া যায় তাহলে

হয়তো কমবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে পেটের মাংসগুলো কুঁকড়ে, থরথর করে কাঁপছে। শায়ার দড়িটা আরো শক্ত করে বাঁধলে এই কাঁপুনিটা কমবে বোধ হয়। ওরা কেউ কথা বলছে না, তার মানে খুঁটিয়ে দেখছে। বুলার ব্যাগটা কি মাতুর দিয়ে তৈরী! কাবেরীরটা উড়েদের বটুয়ার মত দড়ি বাঁধা। দেখে হাসি পেয়েছিল। বুলারটায় হাসি পাচ্ছে না। ওদের তু'জনের মধ্যে অনেক তফাত। বুলা কত সাদাসিধে। অনেক লেখাপড়া করেছে। ও নিশ্চয় পটের বিবি সেজে, গল্পের বই নিয়ে জানলার ধারে বসে থাকে না। চাকরির জন্যেই তো লেখাপড়া শেখা। বুলা চাকরি করবে, টাকা রোজগার করবে, ওর বাবার তো অনেক টাকা আছে, তবুও কি চাকরি করবে? কেন করবে না, বাইশ নম্বরে যে ভাড়াটেরা এসেছে, তাদের বাড়ির ছেলেবৌ সবাই রোজগার করে। অনেক টাকা রোজগার হয় ওদের সংসারে, টাকা না হলে কি সুখ আসে। বুলা নিশ্চয় রোজগার করবে, সুখী হবে। সুখী হ'তে তো সবাই চায়। কি আছে ওর ব্যাগটায়। তাড়াতাড়া নোট! মুঠো মুঠো পয়সা! কাবেরীর থলেটায় থাকে রুমাল আর খুচরো ক'টা পয়সা। বুলা নিশ্চয় পুরুষ মানুষের মত অফিস করবে দশটা পাঁচটা। রমার চোখ পড়ল বুলার ঘড়িতে। কতো-টুকু ঘড়ি, সময় দেখে কি করে? কালো কাপড়ের পটিটায় সুন্দর দেখাচ্ছে কব্জির গড়ন। হাতে একগাদা চুড়ি নেই, ভালোই দেখাচ্ছে বালাটা। যা সরু হাত!

—চুপচাপ যে, যা জিগ্যেস করার করো।

বড়বৌ এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তুশ্চিন্তা মাধবীর থেকেও তারই বেশি। পয়সাওলা ভাজ আর ভাইঝি সহজে তার কাছে আসে না। এ বাড়ির অনেকেই তার দাদার সংসারের গল্প শুনেছে। সেই সংসারের মানুষ-জনকে এনে এ বাড়ির সকলকে দেখানর সাধ তার অনেক দিনের। রমার কথা সাত কাহন করে ব'লে ওদের সে এ বাড়িতে এনেছে। রমাকে ছোট থেকে দেখেছে। মেয়েটা নরম স্বভাবের। লেখাপড়া না শিখলেও ঘর গেরস্তালি শিখেছে, উঁচু কথা শেখেনি। যে কোন ঘরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে। বাপ মায়ের সেই সঙ্গে বড় বৌয়েরও মান রাখতে পারবে। নিশ্চিন্ত ছিল বড়বৌ কিন্তু বুলার মায়ের কথায় বার্তায় এখন তুশ্চিন্তা দেখা

দিল। বিয়ের আগে, বাপের বাড়ির সংসারে বড়বৌ যাকে জানত, এখন সে মানুষটার চালচলন কেমন দূরের হয়ে গেছে। তখন দাদা সামান্য কেরানীমাত্র ছিল, তারপর ধাপেধাপে উন্নতি করেছে। কিন্তু তখন আর বড়বৌ বাপের বাড়িতে নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে সে আঁচও করতে পারেনি যে তার দাদা বড়মানুষ হয়েছে। মাঝে মধ্যে বেড়াতে গেছে, মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে, মানুষগুলোর পরিবর্তনটা চোখে পড়েনি। এখন নিজের হাভাতে আওতার মধ্যে বড়বৌয়ের চোখ খুলছে।

—চুল দেখেছ কেমন, বলেছিলুম যা মিলিয়ে দেখ, সত্যি কিনা।

বড়বৌ রমার খোঁপাটা খুলে দিল। পিঠের উপর বেণীটা ঝুলে পড়ল। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল বুলার মা আর ব্যাগটা কাছে টানল বুলা। রমার মনে হ'ল, অমন করে ব্যস্ত হ'য়ে সেও জলের ঘটিটা টানে যখন উনুনে ডাল পোড়ার গন্ধ বেরোয়।

—চুল বুলারও ছিল।

বুলার মার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ পড়ল বুলার দিকে।

রমাও মুখ তুলে দেখল। হাসল বুলা। হাসিটা শুকনো।

—কি করবো যা চুল উঠতে শুরু করেছে, মাথায় চিরুণী দিতে ভয় করে।

বেশ সহজ সুরে হেসেই কথাগুলো বুলা বলল। ওর মা রাগের ভঙ্গিতে তার উত্তর দিল।

—উঠবে না তো কি! সময়ে খাওয়া নেই, শোওয়া নেই। দিন দিন শরীরের যা হাল হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর কথামত গাদাখানেক ওষুধ এসে পড়েই আছে, খাওয়ার সময় আর হয় না।

—শরীর না সারলে কিন্তু বিয়ে হওয়া মুশকিল। বরের পছন্দ হবে না।

বড়বৌয়ের কথায় হাসল বুলা। হাসল সকলেই।

মাধবী এখন খুশি। মুখটুকু যতই সুন্দর হোক, সুন্দরী তাকেই বলে সব জড়িয়ে যাকে দেখতে ভালো লাগে। রমা সুন্দরী না হলেও লক্ষ্মীছিরি আছে। ওকে সামনে রেখে এখন ঘা দেওয়া যায়।

—লেখাপড়াটাই তো সব নয়। আগে শরীর দেখতে হবে মা। শরীরই যদি গেল তা'হলে বিদ্যে দিয়ে কি হবে।

—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ভাবছি মাসখানেক ওকে পাহাড়ে কোথাও পাঠিয়ে দোব। ওর এক বন্ধুর বাবা ইঞ্জিনিয়ার। পাঞ্জাবে থাকে, বেশ মোটা মাইনে পায় প্রায় দেড় হাজার, আমি তো বলেছি পরীক্ষাটা দিয়ে তোরা দুই বন্ধুতে চলে যা।

মাধবী চুপ করে রইল। বড়বৌ জুল জুল ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল রমা আর মাধবী কেমনভাবে কথাটা গ্রহণ করল।

—তোমার নন্দাই এবার পুজোর ছুটিতে মধুপুর যাবে ঠিক করেছে। অপিসের একজন দিন পনরো থেকেই নাকি হজমের গোলমাল সারিয়ে এসেছে।

—কোথাও গিয়ে যে হজমের ব্যায়রাম সারে এ কথা বাপু আমি বিশ্বাস করি না। খাঁটি জিনিস খাও, কোন অসুখ বিসুখের বালাই থাকবে না।

চুপ করে রইল বড়বৌ। সায় দেওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। অবশ্য উত্তর একটা দেওয়া যায়, খাঁটি জিনিস আর কোথায় পাব? তা হলেই কথা বাড়বে। টাকা ফেললে বাঘের দুধ মেলে। সেই আবার টাকার কথা আসবে। দরকার কি ওপথে যাবার। তার থেকে বরং পাত্রী দেখার প্রসঙ্গেই কথার মোড় ঘুরুক।

—কিগো বুলা, তুমি যে একেবারে চুপ?

গলা খাঁকারি দিয়ে বুলা হাসল। তাকাল রমার মুখে। তারপর বড়-বৌকে লক্ষ্য করেই বলল,

—গান জানে?

—ওইটি বাপু বলো না। এত মিষ্টি গলা, ওর মাকে কদ্দিন বলেছি মেয়েটাকে গান শেখাও, ওই তো সান্যালদের মেয়েটা কি ক্যারকেরে গলা, রেডিওয় গান গেয়ে মাস্টারি করে দিব্যি রোজগার করছে, বিয়ে তো টুঁ টুঁ।

—দিন কতোক বুলারও বাতিক হল গান শিখব। মাস্টার রাখা হল। তারপর যা হবার তাই, মেয়ে বলল—ভাল লাগছে না।

বুলার মা মাধবীর দিকে তাকাল। মাধবীর মুখ কঠিন হয়ে গেছে। এ ঘরে যদি রমার বিয়ে হয় তাহলে মেয়ে সুখী হবে না। এরা উঠতি বড়লোক, নতুন সুখের মুখ দেখেছে, নতুন ধরনের কথাবার্তায় এদের

আনন্দ। কিন্তু মনটা সেই ভাড়াটে বাড়ির মতই রয়ে গেছে। চট করে তো আর মনটাকে পাল্টে ফেলা যায় না, কিন্তু পাল্টাবার চেষ্টাটা খুব। তাই নতুন আর পুরোনোয় টানাটানি চলে যতক্ষণ না সম্পর্কটা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু এ সম্পর্ক কি এক পুরুষে ছেঁড়ার? মধুসূদনবাবু বনেদী বড়লোকের ঘরের ছেলে। মাধবীর মধুসূদনকে মনে পড়ল এখন। ডালওলা একদিন বাকি দামের জন্য সামান্য গলা চড়িয়েছিল, তাই ক্ষেপে গিয়ে জুতো মেরেছিল। সারা বাড়ি অবাক হয়ে গেছল ওর পাগলামি দেখে। পাগলামি ছাড়া আর কি। নগদ দামে শুধু এ বাড়ি কেন, পাড়ার ক'জনই বা জিনিস কিনতে পারে। মিষ্টি কথায়, মিথ্যে কথায় ফিরিওয়ালাদের খুশি করে, আস্তে আস্তে দাম শোধ করতে হয়। গরীব হয়েও মধুসূদনবাবুর মান অপমান জ্ঞানটা টনটনে ছিল। পুরোনো সম্পর্কের বাঁধনটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলতে পারে নি। রমাকে যারা দেখতে এসেছে তারাও পারেনি। এই দোটানার সংসারে রমার মত মেয়েরা শুধু নিজের দুঃখ বাড়ায়। কি হবে মেয়েটাকে সারা জীবন অসুখী করে। তার চেয়ে এরা তাড়াতাড়ি বিদেয় হোক।

—তোমার নাম ঠিকানাটা একটু লিখে দাও তো মা।

রমা এই প্রথম বুলার মার চোখে চোখ রাখল। এতক্ষণ মাধবীর হাজা-ধরা পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে থেকে গা ঘিনঘিন করছিল। বেশ টসটসে ফরসা গাল, অল্প লোম নাকের নিচে, কানে মুক্তোর ফুল, হাসিখুশি মুখটা। লেখবার যা কিছু সরঞ্জাম ওঘরে। সানু ছাড়া এ সংসারে আর কারুর বিশেষ দরকার হয় না লেখার। দিনেশের একটা কলম আছে, সেটা তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সে এখন অপিসে। সানুর কলম নেই, পেন্সিল আছে। সানু এখন স্কুলে। রমা মুখ শুকিয়ে তাকাল মাধবীর দিকে। কেমন থমথমে যেন মুখটা। আর দেরি না করে রমা উঠে পড়ল।

হাতের লেখা আর অঙ্কের জন্য কালি দরকার হয় সানুর। বড়ি গুলে একটা স্নো'র শিশিতে কালি তৈরী করা আছে। শিশিটা রমা মধুসূদনবাবুর বৌয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। শিশির অবস্থা দেখেই বুক শুকিয়ে গেল রমার। সেটাও শুকনো। জল দিয়ে কালি তৈরী করে নিল। কলমের হাতলের মাথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে হয়ে গেছে। ওরা দেখলে

কি মনে করবে। এখন ছুটে গিয়ে যমুনার কাছ থেকে ফাউন্টেনপেন আনা যায়। তা হলে ওঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে। ওরা দেখতে পাবে। যা করা যাবে না তা নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। সানুর একটা খাতা নিয়ে রমা ওঘরে গেল।

জল বেশি পড়েছিল। কালিটা এত পাতলা লেখা পড়া যায় না। বুলা ব্যাগ থেকে তার কলমটা বের করে দিল। শুধু নিজের নয়, বাবার নামটাও লিখতে হল। ইংরেজীতে রমা নিজের নামটা লিখতে পারল শুধু। লেখা কাগজটা পাট করে বুলা ব্যাগে রাখল।

এরপর আর বেশিক্ষণ থাকেনি ওরা। বড়বৌ ওদের নিয়ে গেল, অন্য ভাড়াটেদের দেখাবার জন্য। সঙ্গে মাধবীও গেল। দেখার জন্য রমা দরজার পাল্লাটা ফাঁক করে উঁকি দিল। উঠোনের এক কোণায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যমুনা, হাতে ছাই, পোড়া কড়াইটা প্রায় ঝকঝকে হয়ে এসেছে। হাত নেড়ে বড়বৌ বুলাদের কি যেন বলল। যমুনা হাসল। চটপট হাত ধুয়ে ওদের নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল।

বিকেলে ছাদে গেল না রমা। কড়িকাঠের কোণায় যে এতদিন ঝুল জমে উঠেছে, হঠাৎ এখন চোখে পড়ল তার। ছবিগুলো বেঁকে আছে মনে হল। দালানে কয়লা রাখার জায়গাটা যদি ইঁট দিয়ে ঘিরে দেওয়া যায় তাহলে মন্দ দেখাবে না। বাজারের থলিটা অন্য কোথাও টাঙিয়ে রাখলে ভাল দেখাবে। গামছাগুলো আজকেই সেদ্দ করতে হবে। সংসারটাকে উলটে পালটে নতুন করে সাজিয়ে তোলার ইচ্ছেটা আজই প্রথম মনে এল রমার। ইচ্ছে কখনো ফেলে রাখতে নেই। তাহলে কোনদিনই পূরণ হবে না। সারা বিকেল রমা ব্যস্ত রইল।

মাঝে মাঝে জ্বর ভাব হয় মাধবীর। তখন মেজাজটা বিগড়ে যায়। বিকেল থেকে তার শরীর খারাপ। আটা মাখতে গিয়ে বেশি জল দিয়ে ফেলেছে রমা। বরাদ্দের থেকে কিছুটা বেশি আটা মিশিয়ে সামলাবার চেষ্টা করায় মাধবীর মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। ঘরে তখন দিনেশ বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। রমার হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে নিজের মনে গজগজ করে মাধবী।

—কি করে যে সংসার চালাই তার খবর তো কেউ রাখে না। ছেলেরা মানুষ হচ্ছে কি না, মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করা, সব এ মাগীকেই করতে হবে। আর উনি গায়ে ফুঁ দিয়ে বই পড়বেন।

জুতো পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দিনেশ।

—যাচ্ছ কোন চুলোয়?

জবাব পেল না মাধবী।

—বলি, কথা বলতে পার না, মুখে কি কুড়িকুষ্ঠ হয়েছে?

—মহিমের কাছে যাচ্ছি।

দরজার খিল খুলল দিনেশ। ও যখন খোলে তখন শব্দ হয় না। সুর পালটে মাধবী বলল।

—ওকে ব'লোনা একটা ছেলে দেখে দিতে। কত তো দেখে গেল। শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য দিনেশ দাঁড়িয়ে থাকে নি। প্রত্যেকটা কথা তার কানে গেছে। এমন কথা মাধবী রোজই বলে। আজ বিচ্ছিরি মনে হল রমার। সানু পড়ার নামে ঢুলছিল। সারাদিন বাইরে হুটোপাটি করে, সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসার সময়ই যত রাজ্যের ঘুম ওর চোখে নামে। রমার চড় পিঠে পড়তেই চমকে উঠল সানু। হতভম্ব ভাবটুকু কাটিয়ে লাথি ছুঁড়ল। লাগল না।

—মারলি কেন?

—মারব না? পড়াশুনো নেই, শুধু ঘুম! কালি নেই, কলম নেই, ইস্কুলের কি পড়া করিস? কালকেই দাদাকে খেঁজে নিতে পাঠাব।

কুঁকড়ে গেল সানু। যমুনাও বুলাদের দেখে কুঁকড়ে গেছল। সানুরটা ভয়ে, কিন্তু যমুনারটা? রমা পায়ে পায়ে উনুনের কাছে এল। মাধবী রুটি বেলে রেখেছে, দেরী করলে জড়িয়ে যাবে। তখন বিচ্ছিরি সুরে চীৎকার উঠবে। আজকেই হঠাৎ চীৎকারটাকে কেন ভয় করছে? সানু কিংবা যমুনার মত মনটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। যমুনা লজ্জা পেয়েছিল। রমার মনেও কেমন যেন লজ্জা করছে।

সাবধানে পাট খুলে তাতানো চাটুতে রুটি রাখল রমা। খুন্তিতে ওলট পালট করল। মনের মধ্যেও কত কি জড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোকে যদি

আলাদা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যায়! রুটিতে শুকনো ঘায়ের মত পোড়া দাগ ধরেছে। তাড়াতাড়ি চাটুটা রমা নামিয়ে রাখল। বেশি চিন্তা ভাবনা করলে লোকসান বই লাভ নেই। সেঁকা রুটি উনুনে রাখল সে। টসটসে হয়ে ফুলে উঠল রুটিটা।

রাত করে বাড়ি ফিরল দিনেশ। খাওয়ার পর ঘুমের তোড়জোড় শুরু করছে, তখন মাধবী কাছে এল। দিনেশ জানে মাধবী এবার কি বলবে। খুব আস্তে কথা শুরু করবে। তাই শুনে মনটা খুশি হয়ে উঠবে। দুটো-চারটে হাল্কা কথা হবে। এটাসেটা থেকে সংসারের কথা আসবে। ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে নালিশ উঠবে। খুঁটিনাটি অভাব আর পাওনাদারদের বলে যাওয়া কথাগুলো আবার শুনতে শুনতে অসহ্য বোধ হবে। আর তখনই সরু গলায় সুরটাকে চেপে গালাগাল দেবে অদৃষ্টকে। বিটকেল শোনায় তখন ওর স্বর। চীৎকার যে ধরনেরই হোক, আসলে ওটা নোংরামি। নোংরামিকে দিনেশ ভয় করে। ঝগড়াঝাটিগুলো আসে অভাব থেকে। অভাব শুধু খাওয়া-পরারই নয়, মানসিকও। রবীনকাকার অবস্থা ভাল, লেখাপড়া জানা সংসার। তবু ঝগড়া হয়। ওর ছেলে-বৌ আলাদা সংসার পাতাঁতে চায়, তাই নিয়ে ঝগড়া। কিন্তু এমন গলা চড়িয়ে ওরা কথা বলে না। ওই ধরনের কথা বলাকে মাধবী হয়তো বলবে তর্ক করা। তাই করুক না মাধবী। কিন্তু তর্কে, যুক্তির দরকার। মাধবী যুক্তির ধার ধারে না, কোন কিছু তলিয়ে বুঝতে চায় না। শুধু আঘাত দিতে চায়, নোংরামি চায়। শুনে কষ্ট হয়, এই কষ্ট বোঝার ক্ষমতাটাও মাধবীর লোপ পেয়েছে। অথচ সে আগে কত বোঝ্‌দার ছিল।

কিন্তু মাধবী কেন ধীরে সুস্থে কথাবলার ক্ষমতাটা হারালো? আজ-কালকার কথা শুনলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চেঁচামেচি ক'রে তো চেঁচামেচি বন্ধ করা যায় না। তখন নিজের গলাটা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাতেও সাহসের দরকার। আশ্চর্য, সে সাহসটুকুও নেই। নিজেকে নিজে খুন করার আগে ভাবনা চিন্তা করতে হয়। তাতেও যুক্তির

দরকার হয়। মল্লিকবাড়ির বৌটা পুড়ে মরার আগে চিন্তা করেছিল। না হ'লে চিঠিতে কেন লিখল তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। স্বামীটাকে বাঁচিয়ে গেল। দিনেশকেও ভাবতে হয়, সে মরলে আর কেউ কি বাঁচবে? ছেলেমেয়েগুলো ভেসে যাবে। মাধবীকে ভিক্ষে ক'রতে হবে। তা ছাড়া মরলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। এই শরীরটা, মনটা, জন্ম থেকে এই পর্যন্ত গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতাটা। তার মধ্যে আছে মা'র আদর, বাবার শাসন, সতরো-আঠারো বছরের রোমাঞ্চ, বিয়ের প্রথম তু'টো বছর, চিনুর মুখে প্রথম কথা শোনা। আরো আছে—তুঃখ, বেদনা, ভয়। সব জড়িয়ে তিল তিল গড়ে উঠেছিল যে মানুষটা, তাকে এক নিমেষে শেষ করে দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! ভাবতেও যন্ত্রণা হয়। অথচ বেঁচে থাকাটাও যন্ত্রণার। এর মাঝামাঝি আর কি করার আছে?

—গেছলুম মহিমের ওখানে। সব কথা বললুম, বললো খোঁজ পেলে জানাবে।

—কি জানাবে?

—রমার পাত্তর।

দিনেশ অবাক হ'ল, মাধবী যেন অন্য কিছু ভাবছে। হয়তো অন্য কথা বলতে এসেছে।

—গেছলে যখন, হাতটা দেখিয়ে এলে না কেন?

—কি হবে?

—কি আবার হবে, জানতে ইচ্ছে করে না ভবিষ্যতে কি ঘটবে? গ্রহ-চক্রের ফেরের কথা কিছু কি বলা যায়। জ্যোতিষীর কথা শুনে কানাই স্যাকরা তো বাড়ি হাঁকিয়েছে, লটারির টিকিট কিনে।

—জ্যোতিষীর পরামর্শেই কানাই লটারির টিকেট কিনেছিল একথা কে বললো? হতে পারে তখন ওর তুটো টাকা খরচ করার মত খোশ মেজাজ ছিল, কিংবা তখুনি শুনেছিল কোন লোকের লটারিতে টাকা পাওয়ার গল্প। তাছাড়া এও হতে পারে লটারির টিকিট বিক্রিওলার মুখ দেখে ওর দয়া হয়েছিল কিংবা ঝামেলা এড়াবার জন্য কিনে ফেলেছিল। জ্যোতিষীর গণনা যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কি লটারি জেতা দিয়ে বোঝা যায়?

—তাহলেও ভবিষ্যৎ জানতে তো ইচ্ছে করে।

—ওরা তো ভাল ছাড়া মন্দ বলবে না।

দিনেশকে হাসতে দেখে মাধবী অপ্রস্তুত স্বরে বলল,—ভাল শুনলেও তো মনে খানিকটা জোর পাওয়া যায়।

এমন কথা বিশ্বাস করে না দিনেশ। ভোটের আগে অনেকেই ভাল কথা বলেছিল। কিন্তু সেই ভাল ভাল কথাগুলো ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেশের মানুষ ভুলে গেছে। দেশে শিক্ষা বিস্তার কিংবা বেকার সমস্যার সমাধান নিয়ে দিনেশ মাথা ঘামায় নি। শুধু একটা ভরসা চেয়েছিল, চোখ বুঁজলে সংসারটা যেন ভেসে না যায়। কিংবা বুড়ো বয়সে অথর্ব হয়ে পড়লে না-খেয়ে মরতে না হয়। এইটুকুর জন্যই ভোট দিয়েছিল সে। কিন্তু আজও আশপাশের মানুষজনের হাবভাব কি, কথায় বার্তায় একমুহূর্তের জন্যও নিজেকে নিরাপদ মনে হয় না। মাধবীও বোঝে তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। যদি না বুঝত তাহলে মাঝে মাঝে এমন করে ক্ষেপে ওঠে কেন? কিন্তু ওর ক্ষ্যাপামিটা ভুল লক্ষ্যের দিকে। নয়া পয়সা নিয়ে গোলমাল হলে যাত্রীরা যেমন ওপরওলাদের কাছে প্রতিকারের দাবী না জানিয়ে নিরীহ কণ্ডাক্টারদের মারধোর করে, এও তেমনি। আসলে মাধবী যুক্তি দিয়ে বিচার করে না। তাহলে তো সে বুঝতে পারত সংসারের এই দৈন্যদশার জন্য দিনেশের কোন হাত নেই।

—কথা বলছ না যে, কি ভাবছ?

চমকে উঠল দিনেশ তাকাল মাধবীর দিকে। থুতনির নিচের মাংস কে যেন খুবলে নিয়েছে। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কণ্ঠার হাড় দুটোর মাঝে গর্ত। চুল উঠে গিয়ে কপালটা বেখাপ্পা উঁচু দেখাচ্ছে। চোখদুটো ড্যাবড্যাবে। থ' হয়ে তাকিয়ে রইল দিনেশ। এই মাধবীকে যদি ভালো ভালো কথা শোনান যায় তাহলে কোত্থেকে ও জোর পাবে। ওকে তো শুষে নিয়েছে। ভাল কথার রসে ওর শরীর কিংবা মনের স্বাস্থ্য ফিরবে না। শরীরের স্বাস্থ্যেই তো মনের স্বাস্থ্য।

অথচ এক সময় ছিল যখন টসটস করত মাধবী। ঝগড়া ক'রত, মুখ সরিয়ে নিত। সকালে নাকি মুখ দেখাতে পারে না। সারা গালে ছোপ ধরে

থাকত জমে-ওঠা রক্তের। দিনেশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এই কি সেই মানুষটা! টানাটানা, ভাসাভাসা চোখদুটোর কি হাল হয়েছে! তখন মাইনে কম ছিল, তবুও দাদা, বাবা বেঁচে ছিল, তাই সংসারের আঁচ তেমন গায়ে লাগত না। হাঁড়ি এক হলেও, সাধ-আহ্লাদের খরচগুলো ছিল যে যার নিজের। দুটো মানুষের তা'তে স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যেত। তারপর চিনু জন্মাল। সাধ-আহ্লাদের খরচ কমাতে হ'ল। সংসারে ছোট-খাট ঝগড়া দেখা দিল। ঝগড়া যাতে পাকাপাকি বন্ধ হয় তাই দিনেশই একদিন কথা তু'লল নিজেদের ছোট্ট একটা আলাদা সংসারের। শোনামাত্র মাধবীর সেকি চনমনানি! যেন সত্যিসত্যিই তার আলাদা সংসার হয়েছে। জমির দাম তখন সস্তা ছিল। প্রত্যেকদিনই মাধবী তাড়া দিত। কিন্তু জমি কিনে বাড়ি তোলার টাকা কোথায়? মাধবী সেই প্রথম গুম খেয়ে যায়। তখন থেকেই সে অল্পে চটে উঠতে শুরু করে।

কিন্তু জমি দেখা বন্ধ করে নি দিনেশ। কেমন নেশার মত হয়ে গেছল ব্যাপারটা। খবর পেলেই ছুটে যেত। দর দাম করত। বাড়িতে এসে হিসেব করত। নির্বিকার হয়ে মাধবী শুনে যেত।

আজকাল আর মাধবী চুপ করে থাকে না। কথার পিঠে কথা বলে, চেঁচায়, কেঁদে ওঠে। তখনকার নির্বিকার মাধবীকে দেখে ভয় হ'ত। মনে অস্বস্তির যন্ত্রণা ধ'রত। নিজেকে ছোট মনে হ'ত। বাড়ি করা হয়নি, তার বদলে বাপ, দাদার সংসার থেকে আলাদা হয়ে ভাড়াবাড়িতে উঠতে হয়েছে। মাধবী তা'তেই খুশি হয়েছিল। হাসত, বায়না ধ'রত, আবার হিসেব ক'ষত খরচ কমাবার। সুখের দিন গেছে সেই সময়টা।

—ভাবছি, সেই দর্জিপাড়ার বাড়ির কথা। ও ঘরের আয়নাটা ওখানে উঠে গিয়েই কেনা হয়েছিল। এই খাটটাও।

হঠাৎ একথা বলল কেন দিনেশ! মাধবী অবাক হ'ল। সে তো কবেকার কথা! পুরনো কথা মনে পড়ে যখন মরণ ঘনিয়ে আসে। মাধবী তাকাল দিনেশের মুখে। চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে। মাথার বাদামী চামড়া দেখা যায়। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা। ঢেউয়ের মত গুটিয়ে এসে চোখের কোলে চামড়া জমেছে। বয়স হয়েছে দিনেশের। ও আর বেশি দিন বাঁচবে না।

বুকের মধ্যে চিড়িক ধরল মাধবীর। ভয় করতে শুরু করেছে। তুনিয়ায় এই একটা মানুষ যার কথা সে ভাবে, আর যে তার কথা ভাবে। এই মানুষটাই থাকবে না। বুলাদের দেখে যমুনার জড়োসড়ো ভাব আর ঘরে নিয়ে গিয়ে তাদের বসাবার মধ্যে যে কাঙ্গালপনা ছিল, তাই দেখে জ্বলে উঠেছিল মাধবী। যমুনা যেন গোটা বাড়িটাকেই অপমান করেছে ওদের বেশি খাতির দেখিয়ে। অবস্থা ভাল হলে যমুনা নিশ্চয় তাকেও খাতির করত। আর তখনই মাধবী তার তুরবস্থার জন্য দিনেশকে দায়ী ক'রে অভিশাপ দিয়েছিল মনে মনে। অথচ তখন যদি সে বুঝত দিনেশের বয়স হয়েছে, সে আর বেশি দিন বাঁচবে না, তাহলে কি শাপমণ্যি করত!

—তোমার বালিশটা বড় পাতলা। অসুবিধে হয় না শুতে? মোটা বালিশ ছাড়া তো শুতে পারতে না!

খুশি হল দিনেশ। মাধবীর মনটা ভালো হয়ে আসছে। ভালোই হয়েছে ওকে সুখের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে। চারপাশের কষ্টের চাপে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন পুরনো দিনের সুখকে সম্বল করা ছাড়া গতি কি! মনটাকে অনেক বছর হাঁটিয়ে পিছিয়ে নিতে হয়। মন অনেক কিছু দেখতে দেখতে যায়। পথের আনাচে কানাচে কত হীরে, মুক্তো পড়ে আছে!

—অসুবিধে হয় বৈকি। মাথা থেকে বালিশ সরে গেলে আগের মত তো আর কেউ বালিশ ঠিক ক'রে দেয় না।

স্নেহ চায়। জীবনের কামনা বাসনাগুলো মানুষ মেটাতে চায় যখন বুঝতে পারে আর সে বাঁচবে না। মাধবী হাত রাখল দিনেশের কাঁধে। যৌবনের দিনকে ফিরে চায়। অনেক তুঃখ কষ্ট পাওয়া মানুষের এই একটাই তো বেঁচে থাকার ভরসা। দিনেশ আঁকড়ে ধরল মাধবীর হাতটা।

—আমার বালিশ নিয়ে যে হঠাৎ তুর্ভাবনা হল?

—তোমারই বা হঠাৎ দর্জিপাড়ার বাড়ির কথা মনে এল কেন?

মাধবীর গালে হাত রাখল দিনেশ। চোখ বুঁজল মাধবী। সিরসির করছে তার গোটা শরীর। বুলারা চলে যাবার পর বড়বৌকে জিগ্যেস করেছিল, মেয়ে-পছন্দ সম্পর্কে ওরা কিছু বলেছে কিনা। মুখ কালো করে বিরক্তিতে

জবাব দিয়েছিল বড়বৌ, কে জানে বাপু বড়লোকদের ঠ্যাকার-ঠোকর। পয়সার গুমোরেই ফুলছে। কথাগুলো শোনার পর, মাধবীর মনের অবস্থাটা এখনকার মত হয়েছিল।

গালে হঠাৎ চাপ দিল দিনেশ। কদিন থেকেই দাঁতটা নড়ছিল মাধবীর। মুখ বিকৃতি করে দিনেশের হাতটা সরিয়ে দিল।

—শুয়ে পড়ো। আর রাত করতে হবে না।

হুবহু সেই আগের মত কথা। দর্জিপাড়ার বাড়িতে মাধবী পাশ ফিরে অন্য দিকে মুখ করে কথাটা বলত। তখন তারা এক বিছানায় শু'ত। আলোর সুইচে হাত রেখে অপেক্ষা করছে মাধবী দিনেশের শুয়ে পড়ার।

—শোনো।

মাধবী কাছে এল। মাথা নামিয়ে দিনেশ আবার মাথা তুলল। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপরই মাধবীকে দু'হাতে জড়িয়ে কাছে টানল। টাল সামলে, জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে মাধবী আলো নিভিয়ে দিল।

—সারাদিনের খাটাখাটুনিব পর ন্যাকামি করা পোষায় না। তা'ছাড়া লাভই বা কি বুড়ো বয়সে এইসব ক'রে। এক পা তো বাড়িয়েছ ঘাটের দিকে।

মাধবী শু'তে গেল পাশের ঘরে। ভূতের মত দিনেশ বসে রইল।

সারাদিন খাটাখাটুনির পর শোয়ামাত্রই রমা ঘুমিয়ে পড়ে। আজও ঘুম আসছে। কিন্তু জোর করে সে ঘুমকে ঠেকিয়ে রেখেছে। বেশ লাগছে নিজেকে বুলার বৌদি কল্পনা করতে। শান্ত, পরিপাটি ঘর। করার মত কোন কাজ নেই। নেই কে বললো, শাশুড়ীর পান সাজা, চা তৈরি করা, অফিসের জামা কাপড় ঠিক করে রাখা, টুকিটাকি কাজের কি অন্ত আছে! টুকিটাকি কি রকম! কেন, সকালে দাড়ি কামাবার যোগাড়-যন্তর, ভাজা মসলা তৈরি করা, খাওয়ার সময় কাছে বসা, বড়ি দেওয়া। বড়বৌ বুলাদের সম্পর্কে যা বলেছিল রমা এখন মনে করতে চেষ্টা করল। লোকটা খুব শৌখিন। হয়তো

বলবে, চলো সিনেমায় যাই। বুলার মত একটা ব্যাগ নিশ্চয় কিনে দেবে। বুলাকে না নিয়ে কি সিনেমা দেখা ঠিক হবে? কি মনে করবে তাহলে? প্রতিমার দাদা বিয়ের পর বৌকে নিয়ে একা সিনেমা গে'ছল। বোনকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্য সবাই নিন্দে করেছিল। সব থেকে বেশি করেছিল আশা। তার ভাই অমন হলে নাকি বৌসুদ্ধ বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিত! আশাটা ভীষণ হিসকুটে। হবে না কেন, কোনদিন তো আরামের মুখ দেখেনি! কষ্টে কষ্টেই ওর জীবন শেষ হবে। বিশ্ব কবে যে চাকরি পাবে তার ঠিক নেই।

সারাদিনে এই প্রথম বিশ্বকে মনে পড়ল রমার। আর তখনই যত রাজ্যের ঘুম এসে হুড়মুড়িয়ে ওর চোখের পাতা বন্ধ করে দিল।

॥ তিন ॥

এই মুহূর্তে চিনুর কাছে মাধবী অসহ্য। সেই এক কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু নিরুপায় সে। অফিসে অফিসে ধর্ণা দিলে চাকরি পাওয়া যায়। এ ধারণা, সিনেমায় দেখা শিক্ষিত বেকার নায়করা ছাড়া, মেয়েমানুষেও করে না। মুরুব্বী না ধরলে এ বাজারে চাকরি পাওয়া সহজ নয়। আর মুরুব্বীদের অফিস পাড়ার বাইরেই পাকড়াও করা যায়। মাধবীই খুঁজে বার করেছিল তার দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইকে। ব্যাঙ্কের সাতশো টাকার অফিসার। চাকরি দেবার ক্ষমতা রাখে। মাধবী বারবার বলেছিল মামাকে প্রণাম করতে। চিনু করেনি। অবশ্য মামা অতটা লক্ষ্যও করেননি, বলেছিলেন স্ট্রাইক মিটলে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করতে। চিনু দেখা করেছিল। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, চেষ্টা করেও কাউকে ছাঁটাই করা যায়নি।

আর একজন মুরুব্বী পেয়েছিল সে। স্টেটবাসের কণ্ডাক্টারীর চাকরি ক'রে দেবে বলেছিল। চিনু রাজী হয়নি। বাসের ডিপোতে যদি কাজ পাওয়া যায় তাহলে সে রাজী ছিল। কেননা দেয়ালঘেরা ডিপোতে সে কি কাজ করে চেনা পরিচিতের পক্ষে দেখে ফেলা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক বলেছিলেন

বিনিমাইনের এ্যাপ্রেন্টিশ থাকার কথা। বিনিমাইনের খাটুনিতেও খরচ লাগে, কেননা খাটতে হবে মাইনে করা মিস্ত্রির সমান। আর শরীরের ক্ষয় পূরণের খরচা দেবার সামর্থ্য সংসারের নেই। টি-বিতে মরাকে চিনু ঘেন্না করে।

সংসারের কথা চিনু ভাবে। ভাবাটা বেশির ভাগই বুদ্ধি দিয়ে হয়। দেয়ালে সাঁটা সান্নুর ছবিগুলোর মত মনটা মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে বুদ্ধিকেও ছাপিয়ে ওঠে। বুদ্ধিরও একটা পরিসীমা আছে। যে কোন জিনিসের যা হোক গোছের একটা ব্যাখ্যা বুদ্ধি করতে পারে। কিন্তু সংসারটা একটা জিনিস নয়। শুধু টাকা-পয়সা রোজগার, ভাল খাওয়া-পরা, হাসি-খুশির মানেই স্বচ্ছলতা নয়। প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা করার নিজস্ব ধরন আছে। তার আচার আচবণও সকলের থেকে কোনো না কোনো জায়গায় আলাদা। এই আলাদাগুলো যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলে তাকে অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র করছে, তেমনি এই স্বাতন্ত্র্যকে ঘুচিয়ে সকলের মধ্যে নিজেকে এক করে দেবারও অহরহ চেষ্টা চলেছে। না হ'লে মানুষ কেন ছবি দেখে বা গল্প উপন্যাস পড়ে, বা প্রেমে পড়ে? কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোচাতে কি মানুষ পেরেছে? তাই কি কখনো সম্ভব? অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মাধবী যে চীৎকার করে, সেটা তার পক্ষে একান্ত দরকার। চীৎকার করে সে তার মনের ক্ষতির দিক্‌টাকে পূরণ করছে। ভারসাম্য বজায় রাখছে। তা না রাখতে পারলে এতদিনে পাগল হয়ে যেত। চীৎকার করাটা দিনেশেরও দরকার। কিন্তু তারও নিজস্ব ধরন আছে চিন্তা করার। আবার রমার ধারণা, অন্যে ভেবেচিন্তে তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেইটাই মঙ্গলকর। অনেক রীতির চিন্তার সমষ্টি নিয়ে সংসারটা গড়ে উঠেছে। তাই চিনুর কাছে সংসারটা একটা জিনিস নয়।

ভিন্ন উপাদানে তৈরি অনেকগুলো জিনিস একজায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হবেই। তবু মানিয়ে চলতে হয়। এই মানিয়ে চলার একটা ছাঁচ তৈরি হয়ে আছে অনেক কাল ধরে। কালের বদল আছে, ছাঁচেরও। এই ছাঁচ যারা তৈরি ক'রে নিজেদের কাজে লাগায়, তারা যদি কালের সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচটাকেও না বদলায় তাহলেই ঠোকাঠুকি লাগে। ঠোকাঠুকিটা সংসারের মধ্যেই মানুষে মানুষে আবার সংসারের সঙ্গে পরিবেশেরও। মানুষকে তাই

সামলে চলতে হয়। সংসারের গণ্ডির বাইরে কি ওলট-পালট হচ্ছে মাধবীর পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু দিনেশ জানে। তাকে বাইরে বেরোতে হয়। তাকে পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে সংসারটাকে টিঁকিয়ে রাখতে হচ্ছে।

বুদ্ধি দিয়ে চিনু বোঝে এ লড়াইয়ে তারও অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু উচিত বললেই আর পরিবেশ তা' স্বীকার করে নেবে না। চিনু বুদ্ধির তাড়নায় চাকরি খুঁজেছে। চাকরি পায়নি, বুদ্ধি এই পর্যন্ত এসে থমকে গেছে। মন তখন দেখেছে, দিনেশের ভেঙে-পড়া কাঁধ, তোবড়ান গাল, ঘোলাটে চোখ। চিনু লজ্জায় মুখ নামায় দিনেশকে দেখলেই। সে থাকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আবার, রমার ভীতু-ভীতু সরল চোখ দুটোও সে সহ্য করতে পারে না। মেয়েটা বড্ডো বোকা। উনিশ কুড়ি বয়সেও, এই বাড়িটার মধ্যে বেশ সুখেই আছে। ওর কামনা কতো স্বল্প। কি হবে ওর ভবিষ্যতে? ওকে দেখলে বিরক্তি আসে।

আর আছে সানু। চিনুর ধারণা, সানু আছে বলেই সংসারটা টাল সামলে টিঁকে আছে। ছোট বলেই সকলে ওকে আদর করে। ওর খেয়ালগুলোকে সহ্য ক'রে চলে। এইখানেই সানুর সার্থকতা। সংসারকে স্নেহ মমতা ক'রতে শেখায়। দুশ্চিন্তাকেও সহনীয় ক'রে তোলে। সানু সম্পর্কে ভাবনা সকলেরই কম, কেননা ওর কাছ থেকে এখুনি সংসার কিছু প্রত্যাশা করে না। আশা ক'রেও মানুষ অনেক জিনিসই পায় না। মনের কিছুটা অংশ খালি থাকে, ফলে মনটা যেমন ভাবে থাকলে সুস্থ বলা যায়, তা আর থাকে না, একদিকে কাত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সব মানুষই যদি কাত হয়ে পড়ে, তা'হলে সিধে বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু মানুষের স্বভাবই খাড়া থাকা। তাই মনের খালি অংশটাকে ভরাট করে গানের সুরে, কিংবা ছবির রঙে কিংবা অনেক কিছু দিয়ে। এ সংসারটাকেও সানু কাত হয়ে পড়তে দেয়নি।

সানুর মত এ সংসারে, মাধবীর সার্থকতাও চিনু খুঁজে পেয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, যেমন ভাবেই হোক না কেন সংসারের একটা দিনকে আর একটা দিনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মাধবী যেন মজুর। একটা সংসারকে

গেঁথে চলেছে সারা জীবন ধরে। গাঁথুনীর কোন ছক নেই। ওর উদ্দেশ্য শুধু সুখী হওয়া আর সংসারকে সুখী করা। অত্যন্ত মামুলি ইচ্ছে। পরিবেশ বদলেছে কিন্তু ছাঁচ বদলায়নি। ফলে বাইরের সঙ্গে ভেতরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সংসারকে বাইরের সঙ্গে যুক্ত না করলে এ দ্বন্দ্ব ঘুচবে না। মাধবী তার সংসারের বাইরে কি ঘটছে, সে সম্পর্কে অন্ধ। ও শুধু মজুরের মত ভার বয়ে চলেছে। যুক্তিহীন যে কোন চেষ্টাই চিনুর কাছে নির্বুদ্ধিতার সামিল। তাই অসহ্যও। মাধবীকেও অসহ্য লাগে। যেমন এই মুহূর্তে তার লাগছে।

—রমার বিয়ে দেবে দাও, তা'তে আমি কি করবো ?

চিনু পাশ ফিরে শুল, যাতে না মাধবীর মুখ দেখে আরো বিরক্ত হতে হয়।

—চেষ্টা চরিত্তির ক'রে একটা ভাল ছেলে দেখে দে'না। উনি চাকরিতে থাকতে থাকতেই কাজটা চুকে গেলে নিশ্চিন্তি।

নিশ্চিন্তি মাধবী একার জন্য চায় না। চিনু নরম সুরে বলল।

—লেখাপড়া শেখেনি, তার ওপর বুদ্ধিশুদ্ধিও কম।

কথাটা বলেই দুঃখ পেল। রমা ঘরে নাই। শুনলে হয়তো আড়ালে কাঁদবে। বোকারা বেশি অভিমানী হয়। কিন্তু কথাটা সত্যি।

—তাছাড়া টাকা-পয়সা খরচ করবার ক্ষমতাও তো আমাদের নেই।

এইটুকু বলে চিনু যেন অনুপস্থিত রমাকেই সান্ত্বনা দিল। মেঝেয় শুয়ে আছে মাধবী। চোখ জোড়া উপর দিকে স্থির নিবদ্ধ। চিনুও তাকাল। কড়ি-বরগার কাটাকুটি জংশন ষ্টেশনের মত। কালকের কাগজে কোথায় যেন ট্রেন দুর্ঘটনার খবর ছিল। মুখোমুখি ধাক্কা দিয়েছে। চুরমার ইঞ্জিন দুটোর ছবি দেখে ভয় করে। দুর্ঘটনার জন্য দোষী কে ? কে জানে। তদন্ত কমিশন সাক্ষিসাবুদ নিয়ে তার বিচার করুক। যে কোন জিনিস সে যন্ত্রই হোক আর মানুষই হোক, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পথে চলতে হয়। না হলে অনিবার্য ধাক্কা লাগবেই। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের চলার নির্দিষ্ট পথ কোন্‌টে ? হাজার পথ, হাজার চলার ঢঙ্‌। তাহলে মাধবীর সঙ্গে তার ঠোকাঠুকি লাগে কেন ? এ বয়সে এমন ক'রে গায়ে ফুঁ দিয়ে, সংসারের দায়িত্বকে অস্বীকার

করে চলাটা নিশ্চয় ভুল। তা'হলে ঠিক পথ কোন্‌টে? দিনেশের পথ? তার মানে, এখনই ঘাড় কুঁজো করে, রাত্রের শস্তা বাজার সেরে বাড়ি ফেরা, আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘরের মধ্যে থুম্বো মেরে বসে থাকা! অফিসে বাবার বয়সীদের সঙ্গে মেয়েমানুষ নিয়ে আলোচনা! এমনি ক'রে বয়স গড়াতে গড়াতে চিতায় গিয়ে উঠবে।

কিন্তু পরিণাম যে এমন হবেই তার কি ঠিক আছে! হয়তো এমন কোন সুযোগ আসতে পারে, যাতে আর যাই হোক মোটামুটি মানুষের মত দিন কাটান যায়। কিন্তু সুযোগের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না, তাকে ফন্দি ফিকির ক'রে হাতাতে হয়। চিনু ভেবে খুশি হল, চাকরির যে কটা সুযোগ ছিল, তার প্রত্যেকটাই সে চেষ্টা করেছে। পায়নি, অথচ এখনই পাওয়াটা দরকার। দরকারের সঙ্গে সুযোগের সম্পর্কটা অদ্ভুত। কিছুতেই দুটো এক জায়গায় মেলে না। এক সময় মনে হয়েছিল কাবেরীকে দরকার, তার শরীরটাকে দরকার, অথচ কোন সুযোগ এল না। রমার বিয়ে একদিন দিতেই হবে। কিন্তু নিজের জন্য ওর কোন চেষ্টা নেই। সুযোগ কি কেউ কখনো তৈরি করে দেয়? ওটাকে তৈরি করে নিতে হয়। অথচ তাতেও বাগড়া দেয় কতকগুলো সংস্কার। না হলে স্টেটবাসে কণ্ডাক্টারীর সুযোগ তো এসেছিল। তবু কিছু টাকা সংসারে দেওয়া যেত। সত্যিই এই সংস্কারগুলোকে চেষ্টা করে ধ্বংস করা উচিত। চিনু কথাটা দু'বার ভাবল। অর্থাৎ সংস্কারের কথা। তারপরই মনে হ'ল সংস্কারটা শুধু তার একার নয় এই সংসারের সবকটা মানুষের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওগুলো ভাঙা দরকার। না হলে সুযোগ এলেও তাকে ধরা যাবে না।

মাধবী তখন থেকে একই ভাবে তাকিয়ে। কিছু একটা ভাবছে। গলা খাঁকারি দিয়ে চিনু বলল :

—দিনরাত ঘরের মধ্যেই থাকে, বাইরে বেরোতে-টেরোতে দাও না কেন? বন্ধুদের সঙ্গে না মিশলে কি চালাক হয়। তা ছাড়া বাইরে ঘুরলে পাঁচটা জিনিস দেখতে পাবে, বুদ্ধি পাকবে তাতে।

—বুদ্ধি পেকে হবে কি?

—নিজের ব্যবস্থা নিজেই তা হলে করে নিতে পারবে।

—নিজে তো যথেষ্ট বুদ্ধি পাকিয়েছিস, তবে রোজগার করতে পারিস্‌ না কেন ?

এই মুহূর্তে মাধবী অসহ্য। উঠে পড়ল চিনু। আলনা থেকে সার্টটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। বিশ্ব তখন বাড়ি ফিরছিল। গলিতে চিনুর সঙ্গে দেখা শুকনো হেসে ভদ্রতা করল চিনু।

—এখন ফিরছ ?

—হ্যাঁ। গেছলুম এক জায়গায়। অনেকক্ষণ বসতে হল, তাই।

উঠোনের একধারে রোদ্দুরে পিঠ লাগিয়ে রমা কয়লার গুঁড়ো মাখছে ! গুল তৈরি ক'রবে। বিশ্ব সেদিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল।

—চাকরির খোঁজে গেছলে তো ?

বিশ্ব ঘাড় নাড়ল।

—ওরা ওই রকমের। একথা সেকথা বলে বসিয়ে রাখবে, কাজের কথাটি কিছুতেই পাড়তে দেবে না। দেখেছি তো।

—না না, ইনি লোক ভাল। বললেন তো চেষ্টা করবেন। সব মানুষ কি আর এক রকমের হয় ?

চিনু হাসল। বেলা মাঝ-দুপুর। নিশ্চয় বিশ্ব এখনো ভাত খায়নি। তা সত্ত্বেও কি করে ওর মনটা এত উদার হল যে সব মানুষকেই ভালো ভাবতে পারছে ? নাকি রমার উপস্থিতি ওকে খুশি করছে ! তাই সম্ভব। এ বয়সটাই অমন। অমন বলতে কি বোঝায় ? মানুষ সব থেকে ভালবাসে নিজেকে। তাই কি ? তাহলে কি মানুষ অন্যকে ভালবাসতে পারে না ? বিশ্ব কি রমাকে ভালবাসে ? বাসুক, তাতে কিছু অন্যায় নেই। কিন্তু যদি ভালবাসে, তাহলে কেন বাসে। এটা কি শুধুই বয়সের জন্য ?

চিনু রমার দিকে তাকাল। ভিজে চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে কপালের ওপর এসে পড়েছে। মাথা দুলিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে দেবার সময় এদিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটা নিশ্চয় তার দাদাকে উদ্দেশ করে নয়। চিনু বিশ্বর দিকে তাকাল। রমার হাসিটা ওর মুখে লেগে ফেটে পড়ছে।

—যখন বলছ ভাল লোক, তখন দ্যা'খ চেষ্টা করে।

বিড়ি বার করে ফুঁ দিল চিনু। বিশ্বকে ঈর্ষা করার মত কিছুই

নেই। অত্যন্ত সাধারণ, আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মত জীবনটাকে কাটাতে পারবে। টিউশিনী ক'রে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছে। চেষ্টা করছে, হয়তো একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারে। তখন বিয়ে করবে। বিয়ে যদি করে, রমাকেই করুক না। কিন্তু কি এমন গুণ আছে রমার যে বিশ্ব ওকে ভালবাসবে? বিশ্ব শিক্ষিত, গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েট হলেই যে শিক্ষিত হবে তার কোন মানে আছে? রামরতনবাবু তো সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোট দিতে যান নি।

ভালবাসা জিনিসটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত রুচির ওপর নির্ভর করে না। কাবেরীকে তার ভাল লেগেছিল। কাবেরী এখন কলেজে পড়ে, কিন্তু সে শিক্ষিত নয়। কিন্তু তাই ব'লে ভালবাসতে কি অরুচি হয়েছিল? আসলে ভালবাসা কথাটাই ঘোরপ্যাঁচে। তার থেকে ভাললাগা কথাটাই ঠিক। কাবেরীকে ভাল লেগেছিল তার শরীরের জন্য। এই ভাললাগা থেকেই কি ভালবাসা আসে? চুলোয় যাক ওসব কথা। বিশ্ব যদি চাকরি পায় আর রমাকে বিয়ে করে, সে ওরা ভালবাসুক বা না বাসুক তাতে কিছু এসে যায় না, তাহলে ওদের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া উচিত। কথাটা শুনলে মাধবী চীৎকার করবে হয়তো।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে চিনু সেই দিকে তাকিয়েই বলল:

—সর্টহ্যাণ্ড শিখছিলে না?

—হ্যাঁ।

—ভাল। অনেক সুবিধে আছে।

—কই আর সুবিধে হচ্ছে।

যে-কোন দোকানীকে ব্যবসায় লাভ হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ঠিক বিশ্বর মত সুরে আর ভাষায় জবাব দেবে। জীবনটাকে এরা ভাবে কি! বিরক্ত হতে শুরু করল চিনু। দোষটা বিশ্বর না তার পরিবেশের? কিন্তু এই একই পরিবেশের মধ্যে সে নিজেও তো রয়েছে! তাহলে কি মানসিক গঠনের তারতম্য? চিনুর চোখ বিশ্বর মাথায় এসে পড়ল। সাধাসিধে চুল আঁচড়ান। চুলগুলোকে গুছিয়ে নেবার জন্য চিনু মাথায় হাত বুলোল। একই গড়ন বোধ হয়। যে উপাদানে মানুষ গড়ে ওঠে সেটা খুলির মাপে

বোঝা যায় না। অন্তত: বাইরে থেকে বোঝা যায় না। পৃথিবীটাকে আজও সহ্য করা যায় শুধু এইজন্য যে মানুষগুলো একই ধরনের নয়। সত্যিই কি নয়? একটা মেয়েকে দেখে একটা ছেলের মধ্যে কি কি অনুভূতি, আবেগ তৈরি হয়? কাবেরীকে দেখে যে রকম মনে হয়েছিল, বিশ্বর মধ্যেও কি তাই হচ্ছে না রমাকে দেখে?

হঠাৎ ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করল চিনু।

—খাওয়া হয়নি বোধ হয়। আচ্ছা যাও আর আটকে রাখব না।

বিশ্বকে যাবার অনুমতি দিয়ে চিনু নিজেই লম্বা পায়ে চলে গেল। দোতলার বারান্দা থেকে কে যেন কেশে উঠল। রমার দিকে তাকিয়ে হাসতে যাচ্ছিল বিশ্ব, চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। রোদ্দুরে চুল শুকোচ্ছে বড় বৌ। উঠোন থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত গোবেচারী ভঙ্গীতে হেঁটে গেল সে। এ বাড়ির সকলেই জানে বিশ্বকে পছন্দ করে না বড়বৌ। বিশ্বরা আসার আগে এ বাড়িতে একমাত্র গ্র্যাজুয়েট ছিল বড়বৌয়ের স্বামী।

চার পাশের বাতাস যেন মাথাটাকে চেপে ধরেছে। ঝাঁকুনি দিল চিনু। ওতে কিছু হবে না। চাপটা আসছে ভেতর থেকে। ভেতর পরিষ্কার করতে হবে। কেমন করে? কোথাও যদি এখন যাওয়া যায়। কোথায়? কলেজে। যে কলেজে কাবেরী পড়ে। ওকে এখন দেখতে ইচ্ছে করছে।

আঁস্তাকুড়ে গুচ্ছেরখানেক পেঁয়াজের খোসা আর শালপাতা। মাংস এসেছে কোন বাড়িতে। চিনু আশ্চর্য হল, আজতো রোববার কিংবা ছুটির দিন নয়! এ পাড়ায় তো ফাল্গুন মাসেও বাঁধাকপির তরকারির গন্ধ পাওয়া যায়!

পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করছে অমূল্যর বৌ। কাগজওলা সের-প্রতি একপো না আধসের সাফাই করবে! অমূল্য থাকলে নিজে হাতে ওজন ক'রে কাগজ বিক্রি করত। সে এখন অফিসে। বৌটার বোধহয় ছেলে হবে। অমূল্যটা ভীষণ কিপটে। কাগজ বিক্রির কথা জানতে পারলে হয়তো বৌকে ধরে ঠ্যাঙাবে। আবার ছেলের ভাতে ছাদে ম্যারাপ বাঁধবে। ব্যাপারটা

চিনুর কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হল না। অমূল্য বৌকে ভালবাসে। আবার খেটেখুটে পয়সাও রোজগার করতে হয়। রোজগারটা খুব আয়াসে হয় না। পরিবেশের সঙ্গে সংসারের খাপ খাওয়ানোর কথাই আসে। অমূল্য বাইরে ঘোরাফেরা করে। ও বোঝে একটা পয়সা রোজগার করতে কালঘাম ছুটে যায়। পয়সার মর্ম ও বুঝেছে। এই বোঝাটাই ওর কাল হয়েছে। কেননা ঘরের মানুষ তার মত করে ব্যাপারটা বোঝেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ঘর আর বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে বৌ ঠ্যাঙাতে হয় অমূল্যকে। ওতে যন্ত্রণা খানিকটা কমে।

অমূল্যর কথা ভেবে চিনুর মনটা নরম হয়। বাড়িতে অনেকগুলো পুষ্যি থাকলেও আবার ছেলে হবে অমূল্যর। হোক্। যতদিন মানুষ হন্যে থাকবে, ততদিন জন্মের হার বাড়তেই থাকবে। কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হলেও, রাতে বৌকে পাবার জন্যে তো কষ্ট করতে হয় না। যেখানে কষ্ট নেই সেখানেই তো মানুষ যাবে। অমূল্যও তাই করছে। ওর কোন দোষ নেই।

কাবেরীর কলেজে ঢুকে প্রথমেই চিনু রুটিনটা দেখল। এখন ক্লাশ নেই কাবেরীর। দোতলায় উঠল। হয়তো কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছে। কিন্তু ডাকা যায় কেমন করে।' তার থেকেও বড় কথা ডাকার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে হবে। যাচ্ছিলুম এখান দিয়ে, অনেকদিন দেখা হয়নি, ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। কিন্তু অনেকদিন দেখা হয়নি বলে দেখা করতেই হবে, এমন কোন সম্পর্ক কি তাদের মধ্যে আছে? প্রতিবেশি ভাড়াটে, তার বোন, দিদির কাছে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। সেই আলাপের জের টেনে কলেজে গিয়ে দেখা করতে হবে, ব্যাপারটা কাবেরীর মনোমত নাও হতে পারে।

চিনু দাঁড়িয়ে পড়ল দোতলার বারান্দায়। ক্লাশে এখনো প্রফেসাররা আসেনি। কলেজটা মেছোবাজার হয়ে গেছে। মেয়েরা বারান্দায় নিরীহ ছাগল-ছানার মত দাঁড়িয়ে। ছাগল-ছানা শব্দটা মনে মনে বদলে নিল চিনু। ছানারা অমন শান্ত হয়ে থাকতে পারে না। মেয়েদের ওপর চোখ্ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠল সে। না, ঠিক কাবেরীর মতই দেখতে গোলাপী শাড়িকে।

ও যদি সত্যি সত্যিই কাবেরী হোত। তা হলে নিশ্চয় কাছে এসে জিগ্যেস করত, আপনি যে এখানে? তখন বলতেই হোত, এসেছিলুম একটা দরকারে। কিন্তু মিথ্যে বলতে হবে কেন? যদি সত্যি কথাটাই বলা যায় যে, তোমার জন্যই এসেছি কাবেরী, তোমায় একটু দেখব বলে। তাহলে ও কি বলবে?

ঘরের মধ্যে কয়েকটা ছেলে ছুটোপাটি শুরু করেছে। কে যেন চীৎকার করে খিস্তি করল। মেয়েরা নড়েচড়ে নিজেদের মধ্যে দু একটা কথা বলার ছুতোয় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, প্রফেসার আসছে কিনা।

মিথ্যে বলতে হবে কেন। গোলাপী শাড়িকে লক্ষ্য করতে লাগল চিনু। কতকগুলো ক্ষেত্রে সত্যিকথা বলাটা বোকামী। তাতে ক্ষতি বই লাভ হয় না। এক্ষেত্রে লাভ কি হবে? যদি কাবেরী বলে, চলুন কোথাও গিয়ে বসা যাক, এখানে বড্ড গোলমাল। তাহলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসতে হয়, কেননা কলকাতা শহরে বসবার জায়গা বলতে কিছু নেই। রেস্টুরেন্টে বসলে কম করে চার আনা খরচ। খরচটা নিশ্চয় কাবেরী দেবে না। চার আনার বদলে কি পাওয়া যাবে। কিছু না। শুধু একটা উঠতি বয়সী মেয়ের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলা। এর জন্যে চার আনা! তাও পকেটে চার আনা পয়সা নেই। চিনুর মেজাজ চড়তে শুরু করল। কি জন্যে এখানে এলুম!

প্রফেসার আসছে। মেয়েরা ক্লাশে ঢুকল। নিচে নামবার আগে চিনু আর একবার তাকাল। গোলাপী শাড়ির বাহারটা বেশ।

রাস্তায় নেমে চিনু ভাবল কোথায় যাওয়া যায় এ সময়টা। সন্ধ্যে হলে বরং সোনাগাছির গলি দিয়ে যেতে যেতে সব দেখতে দেখতে সময় কাটান যেত। সন্ধ্যের এখনো অনেক দেরী। তারচেয়ে কফি হাউসে যাওয়া যেতে পারে।

—ক'দিন আসনি কেন, সময় হয়নি? খুব কাজ ছিল?

চুপ করে রইল রমা। এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না। আসতে তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু ত'াহলেই প্রশ্ন উঠবে, কেন ভাল লাগছিল না।

মুশকিল এই 'কেন' টাকে নিয়ে, ক'দিন ধরেই সে তন্নতন্ন করে বুঝতে চেষ্টা করেছে ঠিক আগের মত তার মনটা কাজ করছে না কেন? মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পায়নি। শুধু একটু বুঝেছে, সে বদলে যাচ্ছে। কাউকে আর তার ভাল লাগছে না। বিশ্বকেও।

মুশকিলটাও আবার সেইখানে। কাউকে ভাল না লাগার জন্য আশপাশের যা কিছু দেখছে তাই বিচ্ছিরি লাগছে। আর সবকিছুর ওপর ঘেন্না নিয়ে একদণ্ডও তিষ্ঠোন যায় না। হাঁপ ছাড়ার একটা ছুতো চাই।

বিশ্ব সময় কাটাবার একটা ছুতোই! এ কথাটা রমা এই মুহূর্তে ভাবল। শুধু এই সময়টুকু তো নয়, সারা দিনরাতই ওর কথা ভাবতে ভাবতে হুশ করে কেটে যায়। কোন কিছুর আঁচ গায়ে লাগল কিনা বোঝাই যায় না। তাছাড়া শুধু মনটাই তো নয়, শরীরটাও আছে। বিশ্বর কাছে এলে বা ওর কথা ভাবলেই ঝিমঝিম করে ওঠে শরীর। নেশা নেশা লাগে। বিজয়ার দিন যমুনা সিদ্ধি করে। তাই খেয়ে একবার হৈ হৈ করে হেসেছিল। বেশ লেগেছিল তখন। অমনি বেশ লাগে বিশ্বর নেশা। এই নেশাটাই কদিন যেন ফিকে লাগছে।

রোজ রোজ এই রকম ভাবে আসা, জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলা, আর একই কথা বলা। কদ্দিন ভাল লাগে! সারা জীবন ধরে এমন করে চলে না, চলবেও না। এ ক'দিন ভাবতে ভাবতে রমা এইটেই বুঝেছে পুরুষদের থেকে মেয়েদের জীবনটা আলাদা ধরনের। মাধবী, বড়বৌ, যমুনাদের দেখেই এই ধারণাটা হয়েছে। ওদের থেকে সে কোন অংশেই আলাদা নয়। সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। বিয়ে হবে। নতুন সংসারে যেতে হবে। ছেলেপুলে হবে। সমাজের নিয়ম কানুনগুলোকে মানতে হবে। এতগুলো 'হবে' পুরুষরা ইচ্ছে করলে নাও স্বীকার করতে পারে। সুবিধেটা ওদেরই বেশি। কিন্তু সুবিধে যদি কোন মেয়ে পায় তাহলে ছেড়ে দেওয়াটা বোকামি। বুলাদের মত কোন সংসারে যদি বিয়ে হয়, তাহলে বিশ্বর ঘর করতে তার মোটেই ইচ্ছে নেই। হয়তো বুলাদের সংসারে যাওয়া হবে না, কিন্তু এমনও হতে পারে, ওদের থেকেও বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ল। সব-কিছুই তো সম্ভব হয়। তাহলে বিশ্বর ওপর ভরসা করেই বা কি লাভ!

—কি, কথা বলছ না যে। আসনি কেন?

—এমনি।

—শুধু এমনি?

রমা তাকাল বিশ্বর মুখে। জ্বলছে মুখটা। আকাশে মুখ তুলল রমা। সূর্যটা বাতাস ঝলসাচ্ছে। তিরতির করে দূরের বাড়িগুলো কাঁপছে। শরীরে নেশা লাগছে। এতক্ষণ ধরে যা ভাবছিল রমা, গুলিয়ে যেতে শুরু করল।

—কি ভাবছ?

—কই?

—কই! তোমার ভাবনা কি আমি জানব?

—না কিছু ভাবিনি তো।

গলা কেঁপে উঠল রমার। আহা এমন নেশা সারা জীবন কেন থাকে না। কি হবে দিনরাত সংসারের কথা ভেবে। এই মুহূর্তে শরীর আর মন যে অবস্থায় আছে, সেইটেই এখনকার মত বড় কথা। এখন সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এই ভাললাগাটুকুকে নষ্ট করা বোকামি।

—আমি আসিনি বলে তুমিও তো খোঁজ নাওনি। মরলুম কি বাঁচলুম তাতে তো তোমার বয়েই গেল।

রমার ভাল লাগছে অপ্রস্তুত বিশ্বর মুখটাকে। কথা হাতড়াচ্ছে লাগসই গোছের কিছু একটা বলার জন্য। বলুক এমন কিছু একটা, যার কোন মানে হয় না। ভাল লাগবে।

—আমার না তোমার, বয়ে গেল? আমিতো কতবার ওপর-নীচ করেছি।

এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে বিশ্বর মনটা। হোক্। সাজানো গোছানো কথা ভাল লাগেনা এ সময়। তৈরি করা কথায় সময় কাটেনা। এখন সময় কাটাতে হবে। তার জন্য আগোছাল কথা দেদার খরচ করতে হবে।

—কি করছিলে?

—কিচ্ছু না।

—রাগ করেছ?

—না।

বিশ্বর স্বরটা ভারি। জ্বরো রুগীর মত টসটস করছে চোখ দুটো। অধৈর্য হয়ে জানলার গরাদগুলো যেন বেঁকিয়ে ফেলবে।

—ভাবছি তোমায় বলব বাইরে আর কদ্দিন দাঁড়াবে? ভেতরে আসবে না?

—ভেতরে যাব কি, ওরা সব রয়েছে না!

—থাকলেই বা।

—বাঃ কি ভাববে না!

—ভাবলেই বা।

বেশ লাগছে রমার। বিশ্ব কি বলতে চায় তা সে অনেকক্ষণ বুঝেছে। সে কথাটা জানলেই তো কথা বলা ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে না বোঝার ভান করলে, কথা গড়াবে অনেকক্ষণ ধরে। তবু সাবধান হওয়া দরকার। এক সময় এ ভান খসাতেই হবে। বরং অন্য কিছু নিয়ে কথা শুরু করা ভাল।

—আগে তুমি চাকরি পাও।

কথাটা বলে মাথা নিচু করে নখ খুঁটতে শুরু করল রমা। কোন সাড়াশব্দ নেই। তাই সে মুখ তুলল। হাতের পেন্সিলটা চোখের সামনে তুলে বিশ্ব কি দেখছে। চোখ দুটো সরু করার জন্য পাতলা ভাঁজ পড়েছে চামড়ার। যেন বিরক্ত হয়েছে। এখন যদি হাল্কাধরনের কিছু বলা যায় তাহলে ভাঁজটা মিলিয়ে যাবে। অথচ ভাঁজগুলো আরো গভীর করে তুলতে ইচ্ছে করল রমার। ভবিষ্যতে যদি ছাড়াছাড়ি হয়, তার জন্য এখন থেকেই তৈরি হওয়া ভাল। আস্তে আস্তে তারা পরস্পরের ওপর বিরক্ত হয়ে দূরে সরে যাবে। কেউ কিছু মনে করে রাখবে না।

—মন দিয়ে চাকরির চেষ্টা করো। এতলোক তো পাচ্ছে।

—আজ গেছলুম একজনের কাছে, বললতো করে দেবে।

—কিন্তু দাদা যে বলল, হয়রানি ক'রে শেষকালে দেবে না!

একটা কাক ট্যাঙ্কের ওপর বসেই উড়ে গেল। বিশ্রী ওর ডানার শব্দটা। তার থেকেও বিশ্রী বিশ্বর গলার স্বরটা।

—তোমার দাদাতো মস্ত পণ্ডিত! নিজে কিছু করতে পারেনা, বড় বড় বোলচাল মেরে বেড়ায় খালি।

—বোলচাল মারুক আর যাই করুক, তুমি কি করছ ?

—আমি কি করছি না করছি, তা শুনে তোমার কি আরো ছুটো হাত গজাবে ?

—তাই বলে জানলায় দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করলেও পেট ভরবে না।

—আমার পেট আমি বুঝব তোমায় ভাবতে হবে না।

নিজেকে হাল্কা মনে হচ্ছে রমার। অনেকখানি দায় যেন মাথা থেকে নেমে গেল।

—বেশ ভাবব না। জানলায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাক, তাহলেই আকাশ থেকে টুপ করে চাকরি খসে পড়বে।

—তোমার কি ধারণা আমি দিনরাত জানলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকি ? ঘরের মধ্যেই তো সব সময় থাক, বুঝবে কি করে বাইরের হালচাল কেমন।

—ঘরে বসে থাকলে কি কিছু বোঝা যায় না ভেবেছ ? নিজেকে দেখছি খুব চালাক ভাব।

আর কথা কাটাকাটি করল না বিশ্ব। রমাও চুপ করে গেল। মুখ তুলে একবার তাকাল আকাশে। ফোঁটা ফোঁটা কতকগুলো চিল। চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে চাকর শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে গেল। দোতলার জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে পায়চারি করতে করতে বই পড়ছে। রেডিওর এরিয়ালে মরা কাকের মত একটা ঘুড়ি লটপট করছে। টবের মাটিতে চান করবার জন্য ছুটো চড়ুই উড়ে এল। আবার তক্ষুনি উড়ে গেল। কালো পিঁপড়ের সার মুখে ডিম নিয়ে চলেছে জানলার চৌকাট ধরে। বিশ্ব মুখ নামিয়ে কি যেন ভাবছে তখন থেকে।

—কথা বলছ না কেন, চলে যাব ?

মুখে তুলে বিশ্ব হাসল। শুকনো হাসি।

—আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমি কি করব বলতে পার ? তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলেই ভাল হত। যেমন দিন কাটছিল তেমনিই কাটত।

কান্নার মত শোনাচ্ছে বিশ্বর কথাগুলো। রমার ইচ্ছে করছে ছুহাতে

ওর মুখটা ধরতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। বিশ্বর আঙুলের ওপর সে হাত রাখল।

—কিচ্ছু হবে না। চাকরি হয়তো একটা পাব। কিন্তু আমাদের বিরক্তি কোন দিনই ঘুচবে না।

—কে বললো ?

এইটুকু কথা বলতেই গলা আটকে গেল রমার। চোখে চোখ রাখল বিশ্ব।

—কে আবার বলবে ? চাকরি পেলে আমাদের বিয়েটা হয়তো হয়ে যাবে, কিন্তু তা হলেই কি সুখী হব ?

—এ রকম করে কথা বললে আর কিন্তু আসব না।

—আমরা বড্ডো একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি। এই একঘেয়েমিটা কাটানো উচিত।

কথা বলল না রমা। ক্লান্তি তারও এসেছে। এটা কাটিয়ে ওঠা দরকার। নয়তো এই ঘিঞ্জি বাড়িটায় একমুহূর্তও তিষ্ঠোন যাবে না। কিন্তু এ ক্লান্তি কাটবে কেমন করে ? কি এমন যাদু জানে বিশ্ব যে একঘেয়েমি কাটিয়ে দিতে পারবে ? এই ছোট বাড়িটাকে কি ও বড় করে দিতে পারবে ? এ বাড়ির মানুষগুলোর স্বভাব কি ও বদলিয়ে দিতে পারবে ? বাইরে থেকে চেষ্টা করে কি বদল করা সম্ভব, যতক্ষণ না ভেতর থেকে বদলাবার তাগিদ আসে ? এ বাড়িটাই তো ধুঁকছে। এর মানুষগুলো মরতে বসেছে। তা হলে বিশ্ব একঘেয়েমি কাটাবে কেমন করে। স্তোক দিচ্ছে। তার মনেই কোন মতলব আছে। সেটা কি হতে পারে !

—কি করে কাটাবে ?

—আমাদের সাধ্যে কুলোয়, এমন ভাবে।

রমার গলায় হাত রাখল বিশ্ব। হাতটা গলা বেয়ে আস্তে আস্তে নামাচ্ছিল, সরিয়ে দিল রমা।

—কলে জল এসে গেছে বোধ হয়। আমি যাই, নয়তো কল পাব না। নিচের বৌদিকে এক ডাঁই কাপড় সেদ্ধ করতে দেখেছি।

আর কিছু শোনার জন্য রমা দাঁড়াল না। ট্যাঙ্কের ভাঙা কোণায় আঁচলটা

আটকে গেছল। সাবধানে ছাড়িয়ে নিল। তবু ছিঁড়ল একটুখানি। বিরক্ত হল রমা। পরবার মত কাপড় তো মোটে হু'খানা। সিঁড়িটা অন্ধকার। চড়া আলো থেকে এসেই হোঁচট খেল। জ্বালা করছে, বোধ হয় নখটা চোট খেয়েছে। বিরক্তি তো পদে পদে। শাড়িটা ছিঁড়ল, মন খিঁচড়ে গেল। পায়ে লাগল, মন বিগড়ে গেল। এই মনটাকে বিশ্ব মেরামত করবে কতক্ষণের জন্য? আবার তো কোথা থেকে ঘা পড়বে, অমনি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে যাবে। এই ভাঙ্গা আর গড়ে তোলা তো সারাজীবন চালাতে হবে। তাতে কি একেঘেয়েমি বাড়ে না? মাধবীর জীবনটা তো একঘেয়ে। কিন্তু তবু সে নিজেকে টিঁকিয়ে রেখেছে এই করেই। তা না হলে, একটানা জীবনটাও তো একঘেয়ে। এই একঘেয়ে বাড়ির মানুষগুলো মরে গেছে কি? বোধ হয় না। ওপরটা কেমন ঝিমোন মনে হয়, কিন্তু তলায় তলায় কি খাটুনিই না খাটছে। এই ভাঙ্গাগড়ার খাটুনি। এতেই মানুষ বেঁচে আছে।

তা হলে চলে এলুম কেন? এক তলায় পৌঁছে রমা ভাবল। আবার ফিরে গেলেই তো হয়। কলের জল তো সত্যি সত্যিই আর আসেনি। এখনকার মত একঘেয়েমিটা কাটত। সেইটেই তো আপাতত বড় কথা। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। অনেকগুলো 'কিছুক্ষণ' নিয়েই তো গোটা জীবন। জীবনটা মস্ত বড়। একটা 'কিছুক্ষণে'র পর কি ঘটবে তা কে বলতে পারে। তা হলে এখন কি করা উচিত?

ওপরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ফিরে এল রমা। জীবনটা মস্ত বড়। এত বড় যে ভাবাই যায় না। ভাবতে গেলে ক্লান্তি আসে। এই বাড়িটার মধ্যে জীবনটাকে ঠিক দেখা যায় না। দেখার চেষ্টা করলে ক্লান্তি আসে। এতখানি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে ভাবতেই রমার পায়ে ব্যথা শুরু হল।

পাড়ার ছেলেরা দলবেঁধে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে। সান্থ চিড়িয়াখানা দেখেনি। রাত্রে বিছানায় রমার কাছে চার আনা পয়সা চাইল সে চুপিচুপি। কোন উত্তর পেল না। অকাতরে রমা ঘুমোচ্ছে।

॥ চার ॥

বেলা করে বাড়ি ফিরল চিনু হাতে একটা ইলিশ মাছ ঝুলিয়ে। এত-খানি ভারিক্কি চালে আর কোনদিন সে পা ফেলেনি আর এত ছেলেমানুষী সুরে অনেকদিন কথা বলে নি।

—চটপট কেটে ফেল। রমাটা কোথায়? নেই! যায় সে কোন চুলোয়। ব্যাটা তো বলল উলুবেড়ের।

রমা ঘরেই ছিল, চিনু দেখতে পায়নি। মাধবী আর রমা এক সঙ্গেই বেরিয়ে এল।

—ওমা, এযে মস্তো বড়! কত করে নিল?

মাধবী মাছটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। রমা দড়িটা ধরে হাতে ঝোলাল।

—একসের হবে, না?

—তোর মাথা হবে। কি রকম চওড়া দেখেছিস। ওর ডিমের ওজনই হবে আধসের। ব্যাটা বলল উলুবেড়ের। আরে বাবা, আমি কি মাছ চিনি না। বরফ দেওয়া চালানি মাছ, বলে কিনা—

চিনু রমার হাত থেকে মাছটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করল।

—পাঁচপোর একটু বেশি। তিন টাকা করে নিল। খুব নরম হয়নি। ঠকিনি, কি বলো?

মাধবীও দেখছিল। চিনুর প্রশ্নে মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ করল।

—কাটব?

আবার একটা শব্দ করল মাধবী। রমা আঁশ বটি বার করল।

—বঁটিটার অবস্থা দেখেছ, কেমন ভেঙে ভেঙে গেছে। এতে কি অত বড় মাছ কাটা যায়। বউদিরটা আনব?

—আন।

মাছটা হাতে নিয়েই রমা বেরোচ্ছিল! মাধবী মনে করিয়ে দিতে রেখে

গেল। যমুনা খেয়ে উঠে দোক্তা পোড়াতে শুরু করেছে। সারা দুপুরটাই তার লাগবে দোক্তা তৈরি করতে। খুব ব্যস্ত হয়ে রমা হাজির হল।

—কি কাণ্ড গ্যাখোতো। এই দুপুরে দাদা এক দেড়সেরী ইলিশ এনে হাজির করেছে, উলুবেড়ের ইলিশ, টাটকা খুব। তাই বাবু এক কাঁড়ি দাম দিয়ে কিনে ফেলল। এখন আমার হয়েছে জ্বালা। কোথায় একটু ঘুমোব তা'না—দাওতো তোমার বঁটিটা।

মাছটা আঙুলের ডগা দিয়ে টিপে পরীক্ষা করল মাধবী, মুখে বিশেষ ভাবান্তর ঘটল না।

—খুব নরম ?

—নাঃ।

আশ্বস্ত হয়ে চিনু জামার বোতাম খুলতে শুরু করল।

—পেলি কোত্থেকে ?

—কোত্থেকে আবার, বাজার থেকে।

-তা' নয়, বলছি পয়সা পেলি কোত্থেকে ?

জামাটা ততক্ষণে চিনু মাথার উপর টেনে এনেছে। বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট, কিছু খুচরো পয়সা আর ছোট্ট চটি বইটা পড়ে গেল মেঝেয়। দেখা মাত্রই মুখ ঘুরিয়ে নিল মাধবী। হতভম্বের মত মাধবীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সম্বিৎ ফিরল চিনুর। আগে সে বইটা তুলে নিল।

—সেই ঘরভাড়ার দালালিটা পেয়েছিস বুঝি ?

মাধবীর অস্বাভাবিক দ্রুত কথার পিছনে চিনু তাড়াতাড়ি তার উত্তরটা জুড়ে দিল।

—তোমার দেখছি এখনো মনে আছে। কবে যে বলেছিলুম।

আলনায় জামাটা টাঙিয়ে রাখার সময় চিনু মাধবীর মুখের পাশটুকু শুধু দেখতে গেল। গালের উঁচু হাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত খোবলান গালটা, দপদপ করছে।

—আজ ন'মাস বাদে তাগাদা দিয়ে দিয়ে মাত্র তিরিশটা টাকা আদায় হল। একবার কাজ হয়ে গেলে কি আর কেউ মনে রাখে। অথচ, তখন তো প্রায়

পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল। একটা যাহোক কিছু ঘর দেখে দাও ভাই, এক মাসের ভাড়া দালালি দোব।

চিনু অপ্রয়োজনে কথাগুলো বলে থামল। মাধবীর গাল এখনো দপ দপ করছে। আগের মতই সে মুখ ঘুরিয়ে কি যেন দেখছে। কি দেখছে? টেবিল, পাঁজি, জানলা, কালীর পট, বিয়ের ছবি, বালিখসা দেয়াল? ওগুলো তো এতবছর ধরে দেখে আসছে। ওতে নতুন কি আছে! তাহলে ভাবছে কিছু। কি ভাবছে? খুব একাগ্র হয়ে ভাববার সময় মানুষ অমন অন্যমনস্ক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয় ভাববার মত কিছু ঘটেছে। কে ঘটাল, আমি? চিনু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। মাধবীকে আর বেশি ভাবতে দেওয়া উচিত নয়।

—ভদ্দরলোকের ছেলে, তুমি তো জানই কানাইবাবুর কতগুলো কাচ্ছা-বাচ্ছা, ভেবেছিলুম দালালিটা নেব না। ওটা খুব বিচ্ছিরি দেখায়। তারপর মনে পড়ল পুজোতো আর ক'মাস পরেই, সানুটার একজোড়া জুতো দরকার, ছোটলোকের মত খালি পায়ে ঘোরে। তোমারো একটা গরদের শাড়ী, সেই একবার মামীমা এসেছিল গরদ পরে, তখন তুমি বলেছিলে—

কথা বন্ধ করল চিনু। জামার পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে মাধবীর হাতে দিল।

—সব দিয়ে দিলি নাকি!

চিনু বোকার মত হেসে গামছায় ঘাড় ঘষতে লাগল।

—ঘর খোঁজার জন্য খাটাখাটুনি করতে হয়েছে। অমনি তো আর টাকা নিসনি। এতে আর বিচ্ছিরির কি আছে। সংসার তো এবার তোর ঘাড়েই এসে পড়বে। উনি বুড়ো হয়েছেন। ওনার আর কদিন। বোনের বিয়ে, ভাইটাকে মানুষ করা, সবই তো তোকেই করতে হবে। তারপর তুই নিজেও গুছিয়ে নে, সংসার তো তোকেও করতে হবে।

খুব আস্তে, থেমে থেমে বলল মাধবী। চিনু শুনল, ঘাড়ের ময়লা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে। চেঁচামেচি করে চিনুর মাথায় কিছু ঢোকান যাবে না। বরং বলা যায় চিনু ইচ্ছে করেই ঢোকাবে না। যে কথায় গুরুত্ব আছে, চিনু শুধু তাই শোনে। আর গুরুতর কথা কখনো চেঁচিয়ে বলা যায় না। গেলেও

এখন আর চেঁচাবার ক্ষমতা তার নেই। অবশ্য চীৎকার করার মত কিছু ঘটে নি। তবু মনের মধ্যে খুব জোর একটা চীৎকার উঠেছিল ওই ছোট্ট চটি বইটা দেখে। তার রেশ এখনো বুকের মধ্যে থরথর করছে। মনটাকে আগে সামলাতে হবে। এমন চীৎকার দিনে অনেকবার ওঠে, কিন্তু এটার সঙ্গে অন্যগুলোর তফাত আছে। অন্যগুলো আগে থাকতেই জানা, এটা হঠাৎ।

সংসার একটা সমুদ্রের মত। মানুষগুলো সব ছোট ছোট নৌকো। ঢেউয়ে টলমল করতে করতেও ঠিক ভেসে বেড়ায়। সেটা হয় মাঝির কেরামতিতে। কিন্তু হঠাৎ তুফান ওঠে, বড় বড় ঢেউ আচমকা ঝাপটা মারে, তখন ঠিকমত হাল সামলাতে না পারলেই নিশ্চিত ডুবে মরা।

মাধবী সত্যি সত্যি যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পেল। যমুনার ঝকঝকে মাছকোটার বঁটি নিয়ে ঢুকল রমা। মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মাছটার মৃত্যু অনেক আগেই ঘটেছে। তবুতো ওটা কাজে লাগবে! মানুষের মন যদি মরে যায়, তাহলে সেটা কি কাজে লাগবে? বঁটিটার মন নেই তবু ওটা কাজে লাগছে। কাজে লাগছে নয়, লাগান হচ্ছে। লাগাচ্ছে মানুষে। মানুষের যদি মন না থাকে বঁটিরও মন নেই। মন যদি না থাকে তাহলে এ সংসার বলে তো কিছু থাকে না।

মাধবী শিউরে উঠল মনে মনে। এ সংসারকে ভালবাসি। না হলে প্রাণপাত করে খাটছি কিসের জন্য। হঠাৎ ঢেউ আসে, আঘাত আসে। ওটাতো আসবেই। তরতর করে সুখে কার জীবনই বা কাটে! আঘাত অনেক রকমের হয়। সব কি আর একটা জীবন দেখে যেতে পারে। তবু সেই মানুষই অভিজ্ঞ, যে অনেক আঘাত পেয়েছে। সুখ কি অভিজ্ঞতা বাড়ায়? রমাটা মহা উৎসাহে এখন মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছে। ওর জীবনে এখন এটা সুখের মুহূর্ত। মাছটা খাওয়া হয়ে যাবার পর, এই সুখ কি টিঁকে থাকবে? দু'একদিনেই ফিকে হয়ে মুছে যাবে। আর দুঃখের মাঝে সুখের স্মৃতি, অসহ্য, অসহ্য। ফুলশয্যার কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা, এখন মনেই পড়ে না। পড়লেও জ্বালা ধরায় মনে। কিন্তু তাই বলে কি অনন্তকাল দুঃখকেই বিয়ের কনের মতো সাজিয়ে গুজিয়ে মনের মধ্যে তুলে রাখতে হবে নাকি! এ দুঃখ

না কাটিয়ে উঠলেই তো ডুবতে হবে। তার মানে মৃত্যু। মরলে সংসার দেখবে কে? এই ছোট সংসারের মানুষগুলোকে দিন থেকে রাত পর্যন্ত আমিই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছি, কাল ওরা কি খাবে তার কথাও ভাবছি। মেয়ের বিয়ে, ছেলের লেখাপড়ার চিন্তা করছি। আমি যদি মরি, ওরাও বাঁচবে না। রমার এই খুশি খুশি মুখ থাকবে না। সানুর লাফালাফি বন্ধ হয়ে যাবে। চিনুই বা কার হাতে টাকা তুলে দেবে!

—না-ধুয়ে, কুটে ফেলিস নি যেন।

—জানি জানি ইলিশ কি করে কুটতে হয়।

ঘাম জমে গেছে রমার কপালে নাকে। হাঁটুতে মুখ ঘষে, মাথার কাছের আঁশগুলো নখ দিয়ে ছাড়াতে লাগল।

—মুড়োর মাছে খুব কাঁটা হয়, সরু সরু, তাই না?

মুখ তুলে একবার তাকাল রমা। মাধবী কোন কথা বলল না। মাছ ধুয়ে কাটতে বসল রমা। দুহাতে মুড়োটাকে বাগিয়ে সে আবার তাকাল মাধবীর মুখের দিকে।

—আর একটু ছেড়ে কাট্। কাল ছ্যাঁচড়া করব'খন।

মুড়োর সঙ্গে বেশ কিছুটা মাছ রেখে কাটল রমা। মাধবীর নির্দেশমত মাছকোটা শেষ হল। চান করে ঘরে ঢুকল চিনু। যমুনাকে বঁটি দিয়ে আসতে বেরিয়ে গেল রমা।

গোটা-ইলিশ এ বাড়িতে হঠাৎ কখনো আসে। নয়তো কাটা-মাছ, একটু বেশি দাম দিয়ে কিনে মুখের স্বাদ বদলায় এ বাড়ির লোকেরা। যমুনা পূর্ব-বঙ্গের মেয়ে। তার কাছ থেকে দোতলার বড় বউ ইলিশ-ভাতে রান্না শিখে একদিন গোটা-ইলিশ এনেছিল। কদিন ধরে সে শুধু ইলিশ-ভাতেরই গল্প করেছিল। রান্নাটা তার ভাল লেগেছিল। ইলিশ মরশুমি মাছ। সারা বছর পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া খুব শস্তার মাছও নয়। আর, এক-টুকরো খেয়েও মন ভরে না।

মনমেজাজ ভাল থাকলে, হাতে বাড়তি কিছু পয়সা কোনরকমে জমে উঠলে, কি খাতিরের কোন অতিথি হাজির হলে কিংবা আর কোন কারণ

ঘটলে, খাওয়া দাওয়ার কিছু ঘটা এ বাড়িতে হয়। মাছ দামি জিনিস, তাছাড়া সব সময় জোটেও না, আর জুটলেও সকলের পাতে পেট ভরিয়ে দেওয়া যায় না। মাছ না হলেও মাংস দেওয়া যায়। সেদিন উৎসব পড়ে যায় যে ঘরে মাংস রান্না হয়। কচি-কাঁচাগুলো ঘুর ঘুর করে উনুনের কাছে। জুলজুল করে তাকায় টগবগে হাঁড়িটার দিকে। বুক ভরে শ্ব'স টেনে মিটিমিটি হাসে এ ওর দিকে তাকিয়ে। বিয়ের বয়সী মেয়েরা টুকরো টুকরো প্রশ্নে বিব্রত করে মায়েদের, কেননা মায়েরাই রান্না করে। মেয়েরা জানে, বিয়ে হবে তাদেরই মতো অবস্থার কোন ঘরে। সেখানে মাংস খাওয়ার দিন রোজ রোজ আসে না। বছরে হঠাৎ কয়েকটা জুটে যায়। তোয়াজ করে পেট ঠেসে খেয়ে নেবে সকলে, যেন অনেকদিন এই খাওয়ার আমেজটুকু মনে থাকে। বৌয়েরা যদি ভাল না রাঁধে,—পুরুষদের ধারণা কমবয়সীরাই ভাল মাংস রাঁধে—তাহলে খাওয়ার মেজাজ মাটি! তাই বৌ হবার আগে নিজেদের গরজেই মেয়েরা মাংস রাঁধা শিখে নেয়। ভাল রান্নার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির মন পাওয়ার যেন সম্পর্ক আছে। তাই আইবুড়ো মেয়েরা রান্নার উমেদারী করে, প্রশ্ন ক'রে ক'রে যতটা পারে জেনে নেয়। বছরে রোজ রোজ মাংস খাওয়ার দিন আসে না, তাই মায়েরাও ভরসা করে আনাড়ির হাতে রান্না ছেড়ে দেয় না। গলদা চিংড়ি এলেও এই একই অবস্থা ঘটে। কিন্তু ইলিশ খেতেই মজা। রান্নায় বিশেষ দড় না হলেও চলে।

—ভাতে করবে, মা?

উনুন খুঁচিয়ে ফেলা হয়েছিল। কাঠকুটো দিয়ে চিনুর জন্য ছুটো মাছ ভেজে দেবার জন্য মাধবী তোড়জোড় শুরু করেছে।

—চিনুকে জিগ্যেস কর। ওতো ঝাল ভালবাসে না।

চুল আঁচড়াচ্ছিল চিনু। রমার কথায় ঝাঁঝিয়ে না বলে দিল। মুখ গোমড়া করে মাধবীর পিছনে এসে দাঁড়াল রমা।

—নিজে কিনে এনেছে কিনা তাই মেজাজ দেখান হল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল চিনু। কথাটা তার কানে গেছে।

—কি বলছিস কি?

—কি আবার বলব। ওপরের জেঠিমারা সেবার ভাতে রেঁধেছিল।

একদিন খেয়েছে, তার গল্পের ঠ্যালায় কান পাতা যায় না, যেন ওরা ছাড়া আর কেউ খেতে পারে না। ঝাল কম দিয়েও তো রাঁধা যায়।

একটু থেমে চিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রমা আবার বলল।

—ঝাল না দিয়ে রাঁধলেও চলে। যে যার ইচ্ছেমত ঝাল দিয়ে নেবে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল চিনু। ঘাড় ফিরিয়ে এই মুহূর্তে মাধবীর মনে হল, রমাটা এখনো কচি। সাত-তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে না দিলেও চলে।

—তাই ভালো। ঝাল পেলেই তো তোমার মেয়ের পেটটা রবারের হয়ে যায়। হাঁড়িসুদ্ধ ভাত সাবড়ে দেবে।

—আহা হা।

আর কথা জোগাল না রমার। চিনুর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। লজ্জা করছে তার। হলেই বা দাদা, শরীর নিয়ে কথা বললে এখন অস্বস্তি লাগে। শরীর নিয়ে কথা বিশ্বও বলে, তখনো কেমন কেমন লাগে। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে তফাত আছে। দুজনেই এক বয়সী, দুজনেই পুরুষ মানুষ, তবু তফাত। এটা কি একই মায়ের পেটে জন্মেছে বলে, না দুজনের বলার মধ্যে, উদ্দেশ্যের পার্থক্য আছে? নিশ্চয় পার্থক্য আছে, না হলে এখন খামকা বিশ্বর কথা মনে পড়ল কেন! এখন মনটা খুশি লাগছে তাই বিশ্বকে মনে পড়ছে। মনের সঙ্গে মনে-পড়ার একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়।

—কৌটোটা খুলে দেখ্ সরষে আছে কি না।

কথাটা বলে মাধবী ঘরে গেল। শরীর খারাপ লাগছে। এবার সে শুয়ে পড়বে।

গনগনে ক্ষিদে নিয়ে রোজই সানু স্কুল থেকে ফেরে। দালানে পা দিয়েই শুরু হয়ে যায় তার চীৎকার। হাতের কাজ ফেলে তখন রমাকে ছুটে আসতে হয়। ওইটুকু ছেলে সেই কোন সকালে দুটি খেয়ে গেছে। ক্ষিদে তো ওর পাবেই।

আজ রমা বিশেষ ব্যস্ত হল না। আঙুলে চুল পাকিয়ে চিরুণী দিয়ে জট ছাড়াচ্ছিল। ঘর থেকেই সে সানুকে ডেকে বলল:

—চট করে একবার মুদির দোকান যা। সরষে নিয়ে আয় চার পয়সার।

—কেন?

—দাদা একটা জিনিস এনেছে।

কথাটা অবিশ্বাস্য। তার সামান্য জীবনের অভিজ্ঞতায়, কখনো দাদাকে কোন জিনিস আনতে দেখে নি। বল্টু যখন আম্পায়ার থাকে তখন তার দলের কেউ বোল্ড আউট হলেও আউট দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে নো-বল ডাকে। যদি কখনো বল্টু আঙুল তুলে আউট দেয় তা'হলে সেটা দাদার জিনিস আনার থেকেও আশ্চর্যের ঘটনা হবে না।

—মুদির দোকান তো এইখানে, যাবি আর আসবি!

—কি এনেছে দাদা?

সানু তার সন্দেহটা কথার সুরেই বলে দেয়। কেননা, আগেও রমা কাজ করিয়ে নেবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছে। আঙুলটা আলগা হয়ে গেছল রমার। তাই জোরে চিরুণী টানতেই চুলের গোড়া জ্বালা করে উঠল।

—যাই আনুক না, ওইটুকু ছেলের অত কথায় কাজ কি।

—পারব না যেতে।

—আস্তে, মা শুয়ে আছে না পাশের ঘরে।

হাত থেকে চিরুণীটা কেড়ে নিল সানু।

—কি বাঁদরামো হচ্ছে শুনি।

—যদি মিথ্যে হয় তা হলে চার আনা পয়সা দিবি, বল?

—কেন, মার কাছে চাইতে পারিস না। আমি কি পয়সার গাছ?

—তবে যাব না।

চিরুণী ফিরিয়ে দিল সানু।

—সরষে না আনলে একটা জিনিস আর খাওয়া হবে না। দালানে গামলা ঢাকা আছে তোর খাবার, খেয়ে নে।

সানুর সঙ্গে রমাও এল দালানে। গামলা সরিয়েই সানু তাকাল রমার দিকে। বল্টু আম্পায়ারের আঙুল আকাশমুখো হলে সে এতটাই আশ্চর্য হত।

—পয়সা দে।

—বা রে, আমার কথা কি মিথ্যে হয়েছে যে পয়সা দোব ?

— তা হলে দোকানি কি অমনিতে সরষে দেবে !

অন্ধকার ঘরে শুয়ে মাধবী ভাবছিল চিনুর কথা। এ বাড়িতে কি আশ-পাশের বাড়িতে যখনই সৎ, পরিশ্রমী, ভালো ছেলের কথা ওঠে, দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় বিশ্ব'র। আর ঠিক তার উল্টোটি সম্পর্কে তাদের মনে পড়ে চিনুকে। গায়ে ফুঁ দিয়ে, বাপের অন্ন কি করে যে একটা জোয়ান ছেলে ধ্বংসাতে পারে, তারা তা বুঝতে পারে না। তার ওপর কারুর সঙ্গে মেশে না, মুখেও বড় বড় কথা। আজ চিনুর পকেট থেকে পড়ে যাওয়া বইটার মলাটে ঘোড়ার ছবি ছিল। চিনু রেস খেলছে। ভাবতে কষ্ট হয়। চিনু সৎ, পরিশ্রমী, ভালো ছেলে হতে পারল না।

চিনু তখন ছ' বছরের, পাশের বাড়ির অরুণ চাকরির প্রথম মাইনেটা যখন তার মা'র হাতে তুলে দিল, তখন মাধবী সেখানে উপস্থিত। ছেলের কপালে সেই টাকা ছুঁইয়ে মা তার থেকে সত্যনারায়ণের শিরনীর জন্য টাকা সরিয়ে রেখে ছিল। দেখে খুশি হয়েছিল মাধবী। অরুণের ফরসা মুখে রক্তের ছোপ, তার মায়ের চোখে স্নেহ আর সুখের চাউনি, স্নিগ্ধ করে দিয়েছিল মাধবীকে। তার মনেও সাধ জেগেছিল, কিন্তু চিনু তখন খুব ছোট। অরুণকে সে বলেছিল বায়স্কোপ দেখাবার জন্য। তখন বয়স কতইবা আর, সাধ আহ্লাদ মরে যায় নি। বায়স্কোপ দেখিয়েছিল অরুণ, সঙ্গে ছিল ওর মা, পিসি আর বামুন-দি। চিনুও জীবনে সেই প্রথম বায়স্কোপ দেখল, খুব অবাক হয়েছিল, তারপরেও কতদিন সে হাতীর গল্প করেছে। সে বইটায় অনেকগুলো হাতী ছিল। মাধবী চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না বইটার নাম। গল্পটাও ভুলে গেছে। শুধু মনে আছে মেয়েটার স্বামী ছবি আঁকত। বেশ ছিপছিপে চেহারটি ছিল।

শিরনী দিয়েছিল অরুণের মা। পাড়ার অনেকে এসেছিল সত্যনারায়ণের পাঁচালি শুনতে। সবাই আশীর্বাদ করেছিল অরুণকে। ওর মা'র হাঁটা চলা লক্ষ্য করেছিল মাধবী। তারও অমন করে হাঁটতে ইচ্ছে করেছিল।

কিন্তু চিনু তখন খুব ছোট। ওর লেখাপড়ার যত্ন নিতে শুরু করল সে। দিনেশকে মাস্টার রাখতে পর্যন্ত বলেছিল। কিন্তু অতটুকু ছেলের পড়ার কাজ তো দিনেশই চালিয়ে দিতে পারে। মাস্টার আর রাখা হয়নি। তাছাড়া লেখাপড়ায় সত্যি মাথা ছিল চিনুর। বেশ কিছুদিন দিনেশ যত্ন করে তাকে পড়িয়েছিল। চিনু বড় হবে। চিনু চাকরি করবে। চাকরির প্রথম মাইনেটা মা'র হাতে তুলে দেবে, সব টাকাটা। এমন কি বাসভাড়ার পয়সাটিও না রেখে। মাধবী সত্যনারায়ণের পূজো দেবে। পোস্টাপিসে কালকেই পাস বই খুলতে হুকুম দেবে আর পড়শীদের কেউ যখন বায়োস্কোপ দেখানর কিংবা খাওয়ার কথা তুলবে, তখন মাইনের অঙ্কটা জানিয়ে লাজুক সুরে আপত্তি করবে চিনু। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা, সেই ছোট্ট চিনু আজ কতবড়টি হয়েছে, পাশ করে চাকরি করছে। মায়ের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে। এতে ওদেরও আনন্দ। ওরা কেন ছাড়বে! তখন অসহায়ের মতো চিনু তার মায়ের দিকে তাকাবে, এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

চিনু আজ রোজগার করার মতো বড় হয়েছে। চিনুকে আজ তার অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য অভিনয় করতে হল। বাড়িভাড়ার দালালির কথাটা কেমন করে যেন মুখে এসে গেল। অথচ একবার মাত্র চিনু কথাটা বলেছিল, তা'ও আট ন'মাস আগে। লজ্জা ঢাকতেই অভিনয় করতে হল। কিন্তু লজ্জাটা কার। চিনুর? এতদিনে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাটা কুঁড়ি থেকে ডালপালা নিয়ে বিরাট হয়ে উঠল সেটা যখন এককোপে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তার ব্যথা ঢাকতে অভিনয় করতে হল। শুধু ব্যথা নয় লজ্জাও তো ছিল। নিজের কাছে নিজের লজ্জা। চিনুর ছোট-বেলার মাধবীর বয়স যেন এখনকার মাধবীকে দেখে মুচকি হাসছে। তার হাসি থামাতে মিথ্যে কথা বলতে হল। আর পাঁচটা সাধারণ মায়ের মতো সে হয়ে উঠতে পারল না। সংসারটা আর পাঁচটা সংসারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারল না, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে টলমল করে উঠল। মাঝি হুঁশিয়ার নয়। পাঁচজনের নানান উপদেশ, সহানুভূতি বিষ ঢেলে দেবে।

ছটফট করে উঠল মাধবী। অন্ধকারেরও জ্বালা আছে। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। এমন কোথাও যেখানে আলো নেই, অন্ধকার

নেই। মানুষজন, শব্দ, ক্ষিদে, ঘাম, গন্ধ, কিচ্ছু নেই। ঘুম চাই। আধো জাগা আধো তন্দ্রার মতো একটা কিছু। বোঝা যাবে এ সংসার চলছে, কখনো জোরে সানুর মতো লাফাতে লাফাতে, কখনো দিনেশের কড়ানাড়ার মতো ঠুকঠুক করে। কিন্তু সেটা শুধু বোঝাই যাবে আর কিছু নয়। বাদ বাকি তন্দ্রার মধ্যে ঘোরপাক খাবে। বড় বড় ঢেউ এলে সেই তন্দ্রাটাই, টুক্ করে ঢেউটাকে ডিঙ্গিয়ে পার ক'রে দেবে।

জ্বলুনি কমছে না। চিনু অবুঝ নয়। মা'র মিথ্যা কথা বলা সে নিশ্চয় ধরে ফেলেছে। আর এই মিথ্যাটা সে ভাঙল না। সেকি মাধবী লজ্জায় পড়বে বলে। চিনু তো জানে তার ওপর কতখানি ভরসা রাখত তার মা। কিন্তু আজ দুজনেই লজ্জায় পড়লুম। স্বচ্ছন্দে পাড়ি দেবার জন্য যে পাল তোলা হয়েছিল সেটা আজ ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। আর কি আপ্রাণ চেষ্টাই না সেটাকে জোড়াতালি দিয়ে আবার খাড়া করার জন্য! এমনি সম্পর্কই আজ সংসারে, মানুষে মানুষে। কিন্তু ধরা তো দুজনেই পড়েছি! চিনুও কেমন অভিনয় করে গেল। যেমন হওয়া উচিত ছিল তা' হয়নি। কেমন বাঁকা পথ ধরে যেন সবাই চলেছে। সবাই নিজেকে লুকোতে ব্যস্ত। আর তাই করতেই জীবন ভোর হয়ে গেল। তা হলে এমন করে বেঁচে থাকার দরকারটা কি!

দরকার না থাকলে সব মানুষই তো জীবন ঘুচিয়ে দিত। কিন্তু দিচ্ছে কই! একটা দুটো মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। অসহ্য হলে বাড়ির বৌ বেরিয়ে যায়। দাশেদের ভাড়াটেরা তাদের বৌয়ের কাণ্ডকারখানায় লজ্জায় উঠে গেল পাড়া ছেড়ে। সবাই বলল বৌটা মরেছে। আসলে তো বেঁচেই গেল। জীবনের খাত বদল করল। ঝুঁকি নিল। হয়তো বাঁচার অর্থ খুঁজে পাবে। নাও পেতে পারে। কিন্তু এমন করে বাঁচার থেকে সাহস দেখান অনেক ভাল। এইটেই আসল কথা। সংসারের কথা ভাবলে,—রমা, সানু, চিনুর কথা ভাবলেই মনটা কেমন গলে গলে পড়ে, ওদের দুঃখ, ভয়, লজ্জাগুলোকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এই ইচ্ছেটাই সাহস যোগায়। ওদের ভালবাসি বলেই না বেঁচে আছি!

তাহলে দোষ কোথায় চিনুর! যারা বলে চিনু সংসারের জন্য ভাবে না, পরিশ্রম করে না, তারা কি সাহায্য করবে, টাকা পয়সা যোগাবে?

উঁকি দিয়েও দেখবে না। তা হলে চিনু কি এমন অন্যায় করেছে রেস খেলে। এই টাকায় দু'চার দিনের তো সংসার খরচ মিটবে। চিনু চেষ্টা করেছে সংসারের জন্য, তার সাধ্যমত। সেও ভালবাসে। এইটেই তো বড় কথা। চিনু যেমন করেই হোক বাঁচার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ কপালের ওপর হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল মাধবী।

—পড়তে বসিস নি ?

—তোমার অসুখ করেছে ?

ভাল লাগল মাধবীর সানুর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিটুকু। ছেলেমেয়েরা তেমন করে ভাল মন্দের খোঁজ নেয় না, ব্যস্ত হয় না তার শরীর খারাপ হলে। ওদের সঙ্গে সম্পর্কটুকু রাক্ষুসে বালির মত সংসার শুষে নিয়েছে। সানুর জিজ্ঞাসা যেন বালির তলা থেকে খুঁড়ে আনল ভালবাসা। কল কল ক'রে ভ'রে উঠছে মন।

— আমি আর বাঁচব না রে, এবার মরে যাব।

- না।

— না কেন ! আমি মরলে তো তোরই ভাল, রোজ রোজ আর পড়তে বসতে বলবে না কেউ।

—আমি রোজ পড়ব।

সানুকে দুহাতে বুকের ওপর টেনে নিল মাধবী। কাঁপছে ওর শরীর। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মাধবী।

—খুব মন দিয়ে পড়বি। যত পরীক্ষা আছে সব কটা পাশ করবি। পাশ না করলে চাকরি পাওয়া যায় না। দেখেছিস তো ও বাড়ির অরুণদা কতোবড় চাকরি করে। ওর চেয়েও বড় চাকরি করবি, কেমন ?

—হুঁ।

—চাকরি করে কি করবি ?

সাড়া দিল না সানু।

—যদি তোর এক হাজার টাকা মাইনে হয় ! এই ভাড়া বাড়িতেই থাকবি না বাড়ি করবি ?

সানু এবারও চুপ।

—তখন মা'র কথা ভুলে যাবিতো!

মাধবীর বুকে মুখ গুঁজে একটা শব্দ করল সানু।

—আঃ ধামসাচ্ছিস কেন, বল না, মনে থাকবেতো তখন। নাকি সাহেব হয়ে যাবি।

—মা আমি চিড়িয়াখানায় যাব।

মুখের ডগায় সাজানো কথাটা অপ্রস্তুত হয়ে আটকে গেল মাধবীর। সানু আবার পয়সার কথা তুলল।

—তোর বাবা এলে চেয়ে নিস্।

—তুমি চেয়ে দাও।

সানুর নিশ্বাস পড়ল মাধবীর মুখে। মাংস ফোঁপরা ক'রে হাড় পর্যন্ত পৌছল যেন নিশ্বাস। যন্ত্রণায় ঝলসানো মাংসের মত চোখের কোল কুঁচকে উঠল। সানু থুতনি ধ'রে টানাটানি শুরু করল।

—ওমা তুমি চেয়ে দাও। আমি চাইলে বাবা দেবে না।

—আঃ জ্বালাসনি এখন, পড়াশুনো নেই নাকি তোর! পড়তে বসগে যা।

সানু চলে গেল। অন্ধকারেরও জ্বালা আছে। এখন কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে মাধবীর।

তখনও ঘর অন্ধকার। অফিস থেকে ফিরেই দিনেশ কপালে ভাঁজ ফেলে মাধবীর পাশে দাঁড়াল। মুখের ওপর থেকে হাত সরাল না মাধবী, শুধু বুকের কাপড় গুছিয়ে নিল।

—জ্বর হয়েছে নাকি?

—না।

—তবে শুয়ে যে?

—এমনি।

জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে ঘর থেকে দিনেশ বেরোল। রমা গরম ।ত গামলায় ঢালছিল। সানু পাশে বসে চুপ করে দেখছে।

—কি কচ্ছিস, ঢালছিস কেন ভাত ?

—ইলিশ ভাতে হবে। দাদা এনেছে।

চটপট জবাব দিল সানু। রমা ভারি ব্যস্ত, তবু মুখ তুলে হাসল।

—চিনু এনেছে ?

দিনেশ কাছে এসে দাঁড়াল। ভাত ঢালতে গিয়ে মেঝেয় কিছু পড়েছে। খুঁটে খুঁটে রমা তুলে রেখে গামলাটায় থালা চাপা দিল।

—চিনু কোত্থেকে পেল !

দিনেশ আবার জিজ্ঞাসা করল অনেকটা স্বগতোক্তির মত।

--সেই কানাইবাবুকে ঘর দেখে দিয়েছিল, তার জন্য আজ তিরিশটা টাকা পেয়েছে। পাঁচপো ওজন। খুব বড় একটা ডিম বেরিয়েছে।

—একটা ডিম কোথায় ? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ডিম, তাই না বাবা ?

রমার কথায় বাধা দিয়ে সানু ভুল ধরিয়ে দিল। হাসল দিনেশ।

—গুঁড়ি গুঁড়ি সুজির মত যেগুলো থাকে সেগুলোতো এক একটা ডিম। তার থেকে এক একটা মাছ হয়, তাই না ?

—হুঁ।

—একটা মাছের কতো বাচ্ছা হয়, লক্ষ লক্ষ ?

—দূর বোকা, অত মাছ হলে তো পুকুর ভর্ত্তি হয়ে যাবে।

রমা এবার সানুর ক্রটিটুকু সেরে দিল।

—ইলিশ মাছ পুকুরে হয় না, নদীতে হয়।

দিনেশ উবু হয়ে বসল। ওরা দুজন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বেশ লাগছে মুখ দুটো। অনেকদিন ওরা এমন করে তাকায় না। অনেকদিন এমন করে সেও ছেলেমেয়েদের কাছে পায় না। মাধবী শুয়ে আছে কেন, সেওতো এসে কাছে বসতে পারে। চিনুটাই বা গেল কোথায়। সবাই এসে বসুক। কিছুক্ষণ হাল্কা কথাবার্তা হোক। এমন সময়তো ন'মাসে ছ'মাসে আসে।

—ভাতে কি করে কত্তে হয় জানিস ? বাঙালরা জানে, ওদের দেশে খুব মাছ হয়, নানান রকম মাছের রান্না জানে।

—আমিও জানি। আজ খেয়ে তারপর বলবে।

—জান বাবা, দিদি কেথেকে শিখেছে?

—আচ্ছা আচ্ছা, খুব ডেঁপোমো হয়েছে, পড়তে বসগে যা।

সান্থু একচুলও নড়ল না। দিনেশের ভাল লাগছে ওদের কথা। ঘাম জমেছে রমার নাকের ছুপাশে। আলোতে ঝিকঝিক করছে। বিয়ের পর ক'দিন নাকছবি পরেছিল মাধবী। রমার নাকটিও টিকোলো। ওর মা'র মতন। চার বছর বয়সে ওর নাক বিঁধিয়েছিল মাধবী। একটা সোনার তারও ক'দিন নাকে ছিল। সেটুকুও গেছে। গেছে ভালই হয়েছে, নাকছবি পরাও আজকাল উঠে গেছে। পথে-ঘাটে মেয়েদের গায়ে আর গয়না দেখা যায় না। যাবে কোথেকে, গয়না কিনতে তো পয়সা লাগে। পয়সা কোথায়? সন্থ বিয়ে হওয়া ছু'চার জনকে দেখা যায় বটে হাতে, গলায় সোনা পরে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু বেশির ভাগেরই তো অন্য অবস্থা। দিনকাল পালটেছে। গয়না না-পরা মেয়ে দেখতে দেখতে ওইটেই চোখে সয়ে গেছে। চোখে এখন খালি হাত দেখতেই ভাল লাগে। পয়সার সঙ্গে চোখের সম্পর্কটা খুব কাছাকাছি।

অথচ বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ এক গা গয়নার বরাদ্দ দেবেই। রুচি পালটেছে ঠিকই, তবু গয়না চাই-ই। যেজন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমায়, সেজন্যই গয়নার চাহিদা। নইলে স্যাকরারাতো না খেয়ে মরতো। রমার বিয়েব সময়ও গয়না দিতে হবে। অত টাকা কোথায়! মহিম আজ যে পাত্রের খবরটা দিল, সেটা যদি লেগে যায়, তাহলে সবদিক দিয়েই ভাল। কিন্তু মাধবীর কি তা পছন্দ হবে?

কড়ার তেল গরম হয়ে উঠেছে। মাছ ছেড়ে দিল রমা। শব্দ হল। তেল ছিটকে গায়ে লাগল দিনেশের। জ্বালা করছে গলার কাছটা।

—ঝাল করবি না ঝোল করবি রে?

—ইলিশমাছ ভেজে রাঁধা হয় না।

—কেন?

—হয় না।

ভরপেট খাওয়ার পর ধীরে সুস্থে ঢেকুর তোলার মত রমা কথাটা উচ্চারণ করল। হা-ভাতের মত সান্থু আবার জিগ্যেস করল।

—তবে সেদিন ট্যাংরা মাছ ভেজে ঝোল করলি কেন ?

—সব মাছ কি এক রকম করে রান্না হয়। চিংড়ি মাছ ভেজে কি মালাই-কারি করে ?

রমার মনে হল সানুটা কখনো মালাইকারি খায়নি। খাবে কি করে। সে নিজেও তো ছ'একবার ছাড়া খায়নি। আভার বিয়েতে মালাইকারি হয়েছিল। আভা ছোটবেলার বন্ধু! বিয়েতে কিছু একটা না দিলে মান থাকে না। মাধবী বলেছিল, গিয়ে কাজ নেই। দিনেশ চুপিচুপি একটা বই কিনে এনেছিল। তাড়াহুড়োয় খুলেও দেখেনি সে। মলাটে ছবি ছিল না বলে মনটা শুধু একবার খচ্ করে উঠেছিল। কিন্তু তবু, যাহোক কিছু একটা হাতে নিয়ে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, এইটেই তখন যথেষ্ট ছিল। বইটাই তো সব নয়, ভালবাসাটাই বড় কথা। সামান্য জিনিসেই তো ভালবাসা বোঝান যায়। বিশ্ব তাকে ভালবাসে বলেই না এঁটো চা অনায়াসে এগিয়ে দেয়। আজ কদিন ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলা হয়নি। ওকে ছ'খানা মাছ দিয়ে এলে হয়! ভালমন্দ খাওয়া যখন-তখন তো আর জোটে না।

—সানু তুই মালাইকারি খাসনি কোনদিন ?

মাথা নাড়ল সানু।

—আচ্ছা তোকে রেঁধে খাওয়াব। বাবা এনো না একদিন। সেই নীলরঙের বড় বড় দাড়াওলা গল্দা। দাড়া দিয়ে বেশ চচ্চড়ি হয়।

তেল লেগে জ্বলছে গলাটা। ফুটন্ত তেলের মত রমার কথাগুলো। দিনেশের গলায় কড়া কড়া কতকগুলো কথা জমে উঠেছে। সংসারের এই হাল, তার ওপর আর আবদার সয় না। কথাগুলো ছেলে ভুলোন সুরে রমা বলেনি। সানু মনে করে রেখে দেবে আর প্রত্যেকদিন খ্যাচ খ্যাচ করবে। তখন একটা লজ্জা আসে মনে। লজ্জা কাটাতে গেলে তিন চার টাকা খরচ করতে হয়। একদিন মাছ খেয়ে কি এমন পুণ্যি হবে! এই যে টাকাগুলো নষ্ট করে মাছ আনল চিনু, এতে কি লাভ হ'ল। পয়সাটা অনেক কাজে লাগত।

কিন্তু কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে এখন রমাকে। বসার ভঙ্গী, হাত নাড়ার ভঙ্গী, চাউনি, সবকিছুর মধ্যেই বেশ ভারিক্কি ভাব। ওইটুকু মেয়েটা কেমন

গিন্নী-গিন্নী চাল শিখে গেছে। একটা নাকছাবি থাকলে মানাতো ভাল। নাকের ঘাম এখনো ঝিকঝিক করছে। মুছতেও ভুলে গেছে। খাটে খুব মেয়েটা। দিনরাতই খাটে। সাধ-আহ্লাদগুলো বলে না। বোঝ্দার মেয়ে, সামলে-সুমলে চলে। আজ মনটা ওর খুশি, তাই বোধ হয় ভুলে গেছে বাপের রোজগারের কথাটা। আহা ভুলে থাকি। কোন কালেই যেন ওকে দুর্দশার কথা না ভাবতে হয়। ওকে কেন, কাউকেই যেন না ভাবতে হয়। চিরটাকালইতো অনিশ্চিত ভাব নিয়ে ভয়ে ভয়ে কাটাতে হ'ল। এমন করে দিন কাটাতে কি ভাল লাগে। আজকের মত সহজ সুখ রোজ আসুক। ওদের হাসিখুশি মুখ দেখেও আনন্দ হয়।

—আজতো ইলিশ হচ্ছে, ও হপ্তায় পারিতো আনব।

—আবার পারি কেন ?

—মাসটা কাটুক।

কান্না-কান্না গলায় সান্নু বলে উঠল।

—না, কালকেই আনো।

—থাম্।

ধমক দিল রমা।

—বলা মাত্রই অমনি চাই। তোর ইস্কুলের মাইনে বাকি রয়েছে না ?

সান্নু নয়, দিনেশও অপ্রতিভ বোধ করল। হাঁটুতে মুখ ঘষে ঘাম মুছে ফেলেছে রমা। ওর খুশি-খুশি ভাবটা নিমেষে মাধবীর মুখের মত হয়ে উঠেছে। বিশ্রি লাগছে এখন দিনেশের। একটু আগের মনের আনন্দটুকু মাটি করে দিল। সুখ কতটুকু থাকে জীবনে ? দুঃখটাই যেন অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। আর তাতেই জ্বলে পুড়ে ভাজাভাজা হয়ে শেষ হতে হবে।

কড়া নামাল রমা। চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে ভাজা ইলিশের। সান্নু এখনই একটা খেতে চাইল। এখন খেলে ভাতের সঙ্গে পাবে না। তাইতেই সান্নু রাজী। গরম মাছটা হাতে লোফালুফি করতে করতে ঘরে চলে গেল।

দিনেশও উঠে পড়ল। মহিম এক পাত্রের খবর দিয়েছে। এখানে বিয়ে হলে অনেক সুবিধে। মাধবীকে রাজী করাতে হবে। সংসারের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। চিনু রোজগার করে মাছ এনেছে। দালালির কাজে

পয়সা আছে। যদি লেগে থাকে তাহলে দু' পয়সা আসবে, সংসারটা দাঁড়াবে। মাছ-টাছ খাওয়াটা এখন বাবুগিরির সমান। চিনু বাড়ি নেই, মাধবীকেই বুঝিয়ে বলতে হবে।

মাধবী সেই এক ভাবেই শুয়ে আছে। আলো জ্বেলে টেবিলের কাছে দাঁড়াল দিনেশ। বইয়ের গাদার ওপরেরটা ওল্টাল একবার। শরৎ গ্রন্থাবলী। চোখ বোলাল। কতকগুলো অক্ষর শুধু, দু একটা নাম, দাঁড়ি, কমা, প্যারা। বই বন্ধ করল দিনেশ।

—চিনুকে বোলো না মন দিয়ে লেগে পড়তে। কিছুইতো করে না, শুধু শুধু,—

—কিসে লাগবে ?

মাধবী কাত হয়ে দিনেশের দিকে তাকাল। মুখোমুখি হয়ে দিনেশ চেয়ারে বসল।

—যাহোক একটা কিছুতো করতে হবে। যে কাজটা ধরেছে তাই বা মন্দ কি।

—কি কাজ ধরেছে ?

—বাড়ি ভাড়ার দালালি !

আবার শুয়ে পড়ল মাধবী। রাগ ধরছে তার দিনেশের ওপর। মানুষটার এখনো বুদ্ধিশুদ্ধি হল না। বিশ্বাস করে নিয়েছে ব্যাপারটা। চিনু যে ধাতের ছেলে তাতে দালালি করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে মনে একটু সন্দেহ পর্যন্ত ওঠেনি। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করাটা বোকামি। অনেকে ঠকিয়েছে তবু আক্কেল হয়নি। সন্দেহ থাকাটা খুব দরকার। ওতে মাথাকে সব সময় চালু রাখতে হয়। বুদ্ধিতে ধার পড়ে।

মাধবীকে চুপ করে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করে দিনেশ। বইটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি আর একটা বই খুলে ধরল চোখের সামনে। এখুনি মাধবীর মুখোমুখি হতে হবে আবার। দিশাহারা হলে চলবে না। মাধবী হয়তো রেগে উঠবে কিন্তু তাকে দাবিয়ে দিতে হবে। এতদিন ওর অনেক কথাই মানতে হয়েছে, সে শুধু চীৎকার অশান্তির ভয়ে। কিন্তু তাতে শান্তি আসেনি। মনের মধ্যে শুধু নিজের অভিযোগগুলোকে পুষে, গুমরে মরতে

হয়েছে। জীবনে কৃতকার্য সবাই হয় না। আর কৃতকার্য কাকে বলে? টাকা-পয়সা, মান-সম্মান। লোকের ওইটেই ধারণা। আসলে খুব ভুল নয় ধারণাটা। সাধারণ জীবনে সুখ শান্তিটাকেই বড় বলে ধরা হয়। টাকা পয়সা না হলে সুখশান্তি আসে না। এটাকে যুক্তি, ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় না। নিজের সংসারের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সম্মান দুর্লভ জিনিস। সুখী মানুষই সম্মানিত। সুখটা যে কি দুর্লভ বস্তু হয়ে উঠেছে এর থেকেই বোঝা যায়। একটু ভাল চাকরি পেলেই মানুষ সম্মানিত হয়ে পড়ছে।

মাধবী অসম্মান করে, দ্রুত বইয়ের পাতা ওল্টায় দিনেশ। হাত কাঁপছে। দেয়ালে শব্দ উঠল। টিকটিকি আরশুলা ধরেছে। আছড়াচ্ছে। মাধবী শুয়ে আছে চোখের ওপর হাত রেখে। পাঁজরার পাশ দুটো ফুলে ফুলে উঠছে নিশ্বাসের সঙ্গে। আরশুলাটার মতো ওকে আছড়ালে কেমন হয়।

দ্রুত পাতা ওল্টায় দিনেশ। মাধবী অসম্মান করে।

দুটি মাত্র মাছের টুকরো। তাইতেই খুশি হল আশা। বিশ্ব মাছ ভালবাসে কিন্তু সংসারের যা হাল, কতদিনতো বিনা মাছেই খাওয়া সারতে হয়। মাছ একা বিশ্বই খায়, তবু টাকা পয়সার জন্য একটুকরো মাছও বাজার থেকে আনে না। ভাইয়ের প্রশংসা করার সময় আশার মুখের ভাব এমন হল যেন সে প্রশংসাই শুনছে। বিশ্বর গুণ যেন তার কৃতিত্বেই সম্ভব হয়েছে।

চুপ করে রমা শুনছিল। বিশ্ব টিউশনি থেকে এখনো ফিরেনি। উনুন কামাই যাচ্ছে। ফিরে আসছিল রমা, ওকে ডেকে আনল আশা সিঁড়ি থেকে।

—আসল খবরই তো দেওয়া হল না। বিশ্ব চাকরি পাচ্ছে জান।

ফ্যালফ্যাল করে রমা বুঝতে চেষ্টা করে প্রথমে। পায়ে পায়ে সে আবার ঘরে ঢোকে। আচমকা কথাটা বলেছে আশা। চাকরি মানেই টাকা, কতকগুলো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি, একটু হাঁপছাড়া, সামান্য সাধ আহ্লাদ-মেটান। একটা চাকরির সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। হঠাৎ চাকরি

পাওয়ার খবর আচমকাই মনে ধাক্কা দেয়। কেননা চাকরি আর মুড়ি-মুড়কি কেনা এক ব্যাপার নয়।

—আজ সকালেই চিঠি এসেছে। সেই কবে ছ'মাস আগে একবার পরীক্ষা দিয়েছিল, তাই ডেকে পাঠিয়েছে। শুরু হবে দেড়শো টাকার ওপর থেকে। তারপর পরীক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাইনেও বাড়বে। আর বিশ্বর যা মাথা, পরীক্ষায় কোনদিন ফেল তো করেনি!

আর শুনতে ইচ্ছে করছে না রমার। হাতের বাটিটা কাঁপছে। এখন ছুটে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে ভাল লাগবে। একটা কথাও আস্ত হয়ে মনে পড়বে না। টুকরো টুকরো কথা বুদবুদের মতো কেটে কেটে যাবে, শুধু সামান্য ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউয়ের কাঁপনটাই তখন ভাল লাগবে মুখ গুঁজড়ে উপভোগ করতে।

আশা বক বক করে চলেছে। কিছুই কানে ঢুকছে না। মাথার ওপরের এরোপ্লেনটা অনেক দূরে চলে গেলে শব্দটা একটানা হয়ে যায়। আশা একটানা শব্দ করে যাচ্ছে। রমার কৌতূহল আর নেই।

—দিদি আমি যাচ্ছি।

ভূতে পাওয়ার মত রমা নামছিল। সিঁড়িটা অন্ধকার। ধাপগুলো ভাঙা। কে যেন ওপরে আসছে। রমা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

—কোথেকে?

একধাপ নিচুতে দাঁড়িয়ে বিশ্ব জিজ্ঞাসা করল।

—তোমাদের ঘর থেকে।

—এখন যে!

—এমনি। একটা খবর শুনলুম, সত্যি?

রমা একধাপ উঠে দাঁড়াল। ভীষণ কাছাকাছি তারা দাঁড়িয়েছিল। সিঁড়িটাও অন্ধকার। যে কেউ এখন এসে পড়তে পারে।

—আগে শুনি খবরটা কি?

—থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না। বলো না সত্যি?

বিশ্ব একধাপ উঠে এল। রমাও পিছিয়ে যাচ্ছিল। বিশ্ব হাতটা ধরে আটকে রাখল।

—বাটি! কি এনেছিলে?

—মাছ। হাত ছাড়।

—পিছিয়ে যাচ্ছিলে কেন। অমনি করে পিছিয়ে পিছিয়ে শেষকালে কিন্তু আমার ঘরেই পৌঁছতে।

কথার জবাব না দিয়ে রমা মোচড় দিয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল।

—কি জবাব দিচ্ছ না যে?

বিশ্ব মুঠো আলগা করল। ছাড়া পেয়েই রমা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিল। আবার ধরল বিশ্ব। দুহাতে ওর দুই বাহু।

—ছাতে যাবে?

ওরা ছাতে এল। এ সময়ে কেউ ছাতে আসে না, তবু হয়তো কেউ এসে পড়তে পারে। কিন্তু আপাতত ওদের যেন কোন ভয়-ডর নেই।

—এই আর না।

মুখটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিল রমা। দু'হাতে আবার টেনে আনল বিশ্ব।

—হাতে বাটি আছে, এবার কিন্তু এক ঘা বসিয়ে দোব।

—দাও।

ঘা দেওয়া হল না। বিশ্বর চুলের ধার ঘেঁষে একটা তারা দেখতে পেল রমা। এক তারা দেখতে নেই। দেখলে কি যেন হয়। আরো দুটো তারা খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কে দেখে! এই বেশ লাগছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।

—এই। এই মেয়েটা!

—উঁ।

—কথা বল।

—কি বলবো।

—যা খুশি।

ঘাড়ে, গলায় মুখ ঘষছে বিশ্ব। দাড়ি কামায় নি। জ্বালা করছে। এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বর কাঁধে নাক চেপে ধরল রমা। নিঃশ্বাস জমে উঠছে বুকের মধ্যে। বুকটা ভারী হয়ে উঠছে। টলটল করছে। মরার কথা ভাবতে এখন ভারি ভাল লাগে।

—একটা চাকরি পাব বোধ হয়।

—দিদি তাই বলছিল।

—তোমার বাবা মা রাজী হবে তো ?

—জানি না। ছাড় এখন, উমুন কামাই যাচ্ছে।

—যাকগে। যদি রাজী না হয় তোমায় নিয়ে পালাব।

—আর চাকরি !

—ওই তোমার দোষ। বড্ড খুঁত ধর কথার।

মজা লাগছে রমার। মিথ্যা বলা বিশ্বর উদ্দেশ্য নয়। তবু আবোল তাবোল কথা বলছে। শুনতে ভাল লাগে। চাকরি পাবে বলেই তাই অনায়াসে চাকরি ছেড়ে পালাবার কথা বলতে পারল। সত্যি সত্যি কি আর তাই বলে পালাবে ! এটা শুধু ভালবাসা কতখানি গভীর, তারই জানান দেওয়া। রমার সত্যিই গর্ব হচ্ছে !

—চাকরি পেলে তো আমায় ভুলে যাবে।

—হুঁ।

—দেড়শো টাকার ওপর মাইনে। কত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আসবে।

—যে অপিসে চাকরি, সেখানে মেয়েরাও চাকরি করে।

—তাহলে তো আরো ভাল। মুখ্যু মেয়েকে তো আর মনেই থাকবে না।

—হ্যাঁ।

—তাহলে ছাড়, চলে যাই। আঃ আমি কি মানুষ নই, লোহা দিয়ে তৈরী ? লাগে না বুঝি ?

—না, তুমি মানুষ। মাংস দিয়েই তৈরি। আর একটু থাক। লক্ষ্মীটি আর একটু থাক।

আরশুলাটাকে মুখে ধরে নিথর হয়ে আছে টিকটিকিটা। মাখমের মত নরম পেট। লেজে সরু সরু দাগ। কালজিরের মত চোখ। মুখের দুপাশে আরশুলার দাঁড়াগুলো গোঁপের মত বেরিয়ে। মাঝে মাঝে খেলার আমোদে যেন দাঁড়াগুলো নাড়াচ্ছে।

আরশুলাটা কি খুব মজা পাচ্ছে! দিনেশ একদৃষ্টে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই টিকটিকিটা ওকে ছেড়ে দেবে। এক ফোঁটা রসও আর তখন বাকি থাকবে না।

এমনি করেই মরতে হবে। মরার সময় মনে এক ফোঁটা কামনাও বাকি থাকবে না। নিঃশেষ হতে হতে তখন এমন অবস্থায় পৌঁছতে হবে যে বাঁচার আর কোন মানেই থাকবে না। কেউ একফোঁটা শোক করবে না। হাঁফ ছেড়ে বলবে সবাই, গেছে ভালই হয়েছে। করুণা পাবার জন্য দুঃখ নেই কিন্তু তার অনুপস্থিতিটা কারুর চোখে ঠেকবে না, দরকারের কথাতেও তাকে মনে পড়বে না, এটাই তো অসহ্য! মরতে যদি হয়তো তেমন করেই মরা উচিত, যখন তার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। প্রয়োজন থাকলেই তার সম্মান আছে। টাকার প্রয়োজন আছে বলেই তার সম্মান আছে। মাধবী তাকে সম্মান করে না, তার মানে কি প্রয়োজন ফুরিয়েছে?

জীবনে কৃতি হতে না পারাটা কি দোষের। প্রত্যেক মানুষের চেষ্টাই তার ক্ষমতার গণ্ডীতে বাঁধা। তাকে লঙ্ঘাতে পারে কে! মাধবীর উচ্চাশা বড় বেশি। তাই গণ্ডীতে পৌঁছেই ঘা খায়। ব্যথায় চীৎকার করে ওঠে। ও যদি মনের ইচ্ছেগুলোকে অতখানি বাড়তে না দিত তা হলে সুখী হ'ত। যেটুকু পেয়েছি তাতেই খুশি থাকা ভাল। কিন্তু সে খুশিটুকুও আর রাখা যাচ্ছে না। হাবে ভাবে মাধবী বুঝিয়ে দিচ্ছে, তার উপস্থিতির আর দরকার নেই। সাহায্য যে করে তাকেই দরকার পড়ে। পরিশ্রমী মানুষকেই দরকারী বলে। মাধবীর চোখে নিজেকে দরকারী করে তুলতে হলে খাটতে হবে। কেমন করে, কি উপায়ে খাটতে হবে? ভগবান জানেন সে কথা। বয়স হয়েছে, এখন সব পথ বন্ধ। সব পথ বন্ধ। সব। আর ক্ষমতা নেই নতুন কিছু করার। বুড়ো সিংহের মত ভালমানুষ সেজে বসে থাকতে হবে যদি কখনো ভুলকরে সুযোগ সুবিধে নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। ভান করতে হবে। নিজের স্বভাব চরিত্র ত্যাগ করতে হবে। বাঁচার জন্য সব পারা যায়। কিন্তু এ বাঁচা কিসের জন্য?

কিসের জন্য বাঁচা একথা তুলে ভাবতে বসলে বাঁচা যায় না। এ সব প্রশ্নের মাথা খাটিয়ে একটা উত্তর খাড়া করা যায়। কিন্তু শরীরটাকে অস্বীকার

করা যায় না। আসলে শরীরের মধ্যেই মনটা থাকে। ফুটো হাঁড়িতে জল থাকে না। সংসারের গোড়াকার দাবিদাওয়া এই শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য। যেমন তেমন করে হোক আগে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হবে। ভালমন্দ বিচার করলে চলবে না। মাধবী সম্মান করল কি করল না তাই নিয়ে মন খারাপ করে কি লাভ! সংসার যদি জীবনের সব রস চুষে খায় তাতেই বা লোকসান কি। প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যায় তখন লাভ কি বেঁচে থেকে। কোন রকমে যখন বাঁচতে হবেই, তখন সাত-পাঁচ না ভাবলেই কি লোকসান হবে কিছু?

লাভ-লোকসান দুটোকেই বিসর্জন দিলে মানুষের আর থাকে কি? কি অদ্ভুত অবস্থা! বিচার বুদ্ধি খাটাবার ক্ষমতাই যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে বুঝব কি করে আমি আছি। আমি বেঁচে আছি। অথচ লাভ-লোকসানের কথা উঠলেই যন্ত্রণা কামড়ায়। আরশুলাটা খেলার আমোদে নয়, যন্ত্রণায় দাঁড়া নাড়ছিল তাহলে। টিকটিকিটার ক্ষিদে পেয়েছে। ওর কিছু অন্যায় হয়নি আরশুলাকে মেরে ফেলায়। ক্ষিদে পেলে তাকে মেটাতেই হবে। সংসারের ক্ষিদে আছে। সংসারটা একটা রাক্ষস। টিকটিকি আর সংসার এক জাতের। মানুষে আর আরশুলায় কোন তফাত নেই।

—বসেই আছ যখন আলোটা নিভিয়ে দাও না।

নিজেকে বোকা মনে হল দিনেশের। বইয়ে চোখ রেখে সে বসে আছে অথচ মাধবী ঠিক বুঝে ফেলেছে সে পড়ছে না। বোধ হয় মাধবী এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।—কারেণ্ট খরচা করে না পড়ে, এসময়টা তো বাইরে কাটাতে পার। মহিম ঠাকুরপোর কাছেওতো যেতে পার।

—আজ গেছলুম মহিমের কাছে। অফিসে ফোন করেছিল ছুটির পর যাবার জন্য। একটা সম্বন্ধের খোঁজ দিল।

উঠে বসল মাধবী। দিনেশ মুখ ঘুরিয়ে দেখল আরশুলাটাকে। টিক-টিকিটা চলে যাচ্ছে। তুলতুলে ভাঁজ পড়ছে পেটে। লেজটা বাঁকানো। থামল। আরশুলাটা এখনো বেঁচে আছে। বারদুয়েক আছড়াল। আবার চলতে শুরু করেছে টিকটিকিটা। লেজটা সাপের ফণার মত নড়ছে।

—হাঁ করে আছ কেন? সবটা বল।

—ভালই সম্বন্ধটা। কলকাতায় দুখানা বাড়ি আছে।

—কি আছে?

—বাড়ি। সাড়ে চারশো টাকা ভাড়া আদায় হয়। পোস্তায় ঝাড়াই মসলার কারবার আছে।

—ছেলে কেমন?

উঠে এল মাধবী টেবিলের পাশে। একটা কোণ আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল। নীল সাপের মতো শিরা, কব্জী থেকে কনুই পর্যন্ত পাকিয়ে দপদপ করছে। হাতটা সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল দিনেশের।

—ছেলে ভালই।

—লেখাপড়া, বয়স, স্বভাব চরিত্র এসব কেমন?

—ভাল।

—কে বলল তোমায়?

—কে আবার বলবে? ভাল বলতে তুমি কি বোঝ? মদ খায়না, রেস খেলে না, তা হলেই ভাল ছেলে হয়? আজকের দিনে ভালমন্দের কোন তফাত আছে নাকি!

তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল দিনেশ। নীল সাপটা ক্রমশ তাকে হিংস্র করে তুলছে। মাধবী আশ্চর্য হয়েছে দিনেশের আচরণে। রাগটাকে চেপে সে বলল:

—তফাত আছে বৈকি। শুধু পয়সা কড়ি দেখলেই চলে না। মেয়ের সুখটা আগে দেখতে হবে।

—তোমার মেয়েই বা এমন কি? ছেলেরাও তো সুখ চায়।

—আমার মেয়েকে পেলে যে ছেলে সুখী হবে, তেমন ছেলেই আমার দরকার। পয়সাওলা ঘরে মেয়েকে না দিলেও দুঃখ নাই।

—কেন পয়সাওলাদের কি হৃদয় বলে কিছু নেই, তারা কি গরীবের মেয়ে কোনদিন বিয়ে করে না? তাছাড়া মহিম এ সম্বন্ধের খোঁজ দিয়েছে যখন, তখন স্বভাব চরিত্রের কথাই ওঠে না।

—তবু আমাদের একটা কর্তব্য আছে।

—সে ত আছেই। জীবনে হাজার কর্তব্য আছে, তার কটা আমরা পালন করি?

—যে কটা পারা যায়, তা করতেই বা ক্ষতি কি! বিয়েটা হেলা-ফেলার জিনিস নয়। তর্ক করে ভালোকে মন্দ করা যায় না। মেয়ের সারা জীবনের সুখ এর ওপর নির্ভর করছে। ছেলের লেখাপড়া কদ্দূর?

—টাকা-পয়সা আছে।

—থাকলেই বা, মেয়ে কি টাকা-পয়সার সঙ্গে ঘর করবে?

—হ্যাঁ, তাই করবে। টাকা-পয়সা না থাকলে শিক্ষাদীক্ষার কোন মানে হয় না।

—বয়স কত?

—বয়স একটু হয়েছে। কিন্তু অত কথায় দরকার কি। কম বয়সী ক্ষয়া চেহারার শিক্ষিত ছেলে তো পথে-ঘাটে দেখা যায়, তুমি তাদের একটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী আছ?

—সে অন্য কথা। ছেলের কত বয়েস?

—দুটি মেয়ে আছে, বৌ মারা গেছে। বড় মেয়েটির বছর পনরো বয়স।

মাধবীর হাতের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল দিনেশ। শিকার ধরে সাপটা যেন গর্তে লুকোল। দিনেশের মেরুদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ঠেলে উঠল। কোথায় লুকোল সাপটা? মাধবীর শরীরে চোখ রাখল সে।

—এর থেকে মেয়েটাকে বিক্রি করে দিলেই তো পার, ঘরে টাকাও আসবে, ঝঞ্ঝাটও চুকবে।

—কিন্তু সংসারের কথাটাও তো ভাবতে হবে। আমি আর ক'দিন। পয়সাওলা জামাই কি তোমাদের দেখাশুনো না করে পারবে! ব্যবসায়ীলোক, চিন্টুটারও একটা হিল্লে করে দিতে পারবে।

—নিজেদের যা আছে তাইতেই চালাব, জামাইয়ের দয়ায় থাকব কেন?

লাফিয়ে উঠল দিনেশ, থরথরিয়ে হাঁটু কাঁপছে। মুখে লালা উঠছে। ঢোক গিলল সে।

—খাবে কি? এরপর খাবে কি? তখন তো আমায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

মাধবী আবার শুয়ে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে দিনেশ তাকিয়ে রইল। মাধবী নয়, সেই টিকটিকিটা পরিতৃপ্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দিনেশ।

দেখতে দেখতে অবসাদে ঝাপসা হয়ে আসে দিনেশের চোখ। টেবিলে মাথা রাখে। হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে।

—বাবা।

সানু ডাকছে। মাথা তুলল দিনেশ।

—চার আনা পয়সা দেবে। বাবু, সান্টে, সোনা, ওরা সবাই চিড়িয়াখানা যাচ্ছে।

থেমে গেল সানু দিনেশের মুখের ভাজগুলোকে বিশ্রীভাবে নড়ে উঠতে দেখে। ভয়ে পিছিয়ে গেল সে। টেবিলের পাশেই ছাতাটা নজরে পড়ল দিনেশের।

—চিড়িয়াখানা যাবি, ফুর্তি করবি, পড়াশুনো বুঝি চুলোয় গেছে। খাবি কি ছুদিন পরে, চিড়িয়াখানা দেখে কি পেট ভরবে?

নির্মমভাবে দিনেশ ছাতা দিয়ে সানুকে পিটতে শুরু করল। মাধবী উঠে এসে সানুকে বাঁচাল। সানু কাঁদেনি। মার খাওয়া ওর অভ্যাস আছে।

—ছেলেকে মেরে কি হবে। তেজ দেখাতে হয় তো বাইরে যাও। মুরোদ কত, তা'ত বোঝাই গেছে।

চেয়ারে বসে পড়ল দিনেশ। অবসন্ন লাগছে। বগলের তলা জবজব করছে। বুকের ওপর দিয়ে ঘাম নামছে। কোমরের কসিতে আটকে গেল। আবার আর একটা স্রোত নামছে। এটাও বাধা পেল। গলার কাছে একটা ব্যথা। ঢোঁক গেলা যাচ্ছে না। চোখের পাতা চটচট করছে। জড়িয়ে যাচ্ছে। আঙুলগুলো তখন থেকে বাঁকানই আছে। বইয়ে কি সব অক্ষর লেখা। এটা কি বই? পাঁজি। আজ কি বার? বেস্পতি। তেরস্পর্শ কাকে বলে। শুক্রপুষ্ট বটিকার বিজ্ঞাপন পাঁজিতে কেন! ধার্মিক লোকেরা এগুলো পড়ে? নিশ্চয় পড়ে, নইলে টাকা খরচ করে ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেবে কেন! মাধবী রোগা হয়ে গেছে। ও খুব খাটে। ওর ভাল কিছু খাওয়া উচিত। টনিক খাওয়া উচিত। মাধবী টিকটিকি নয়।

ওকেও শুষে নিয়েছে সংসার। আমরা সবাই টিকটিকির ছানা। সংসারটা টিকটিকি। আমরাই আবার কখনো কখনো আরশুলা হয়ে যাই। মাধবীকে কি কখনো চুষে খেয়েছি? হয় তো হবে। ও বড় ভাল। মেয়েকে ও ভালবাসে। আমিও বাসি। রমাকে একটা বুড়ো হাবড়ার হাতে তুলে দিচ্ছিলুম। মাধবী হ'তে দিল না। মাধবী ভালো। ওকি আজ আসবে না। আসতে আজ এত দেরি হচ্ছে কেন?

ঘুমোতে চাইছে না রমা। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করলেই ঝুরঝুরে কয়লার গুঁড়ো পড়ে। পড়তে পড়তে ঢিপি হয়ে যায়। তখন চোখ আটকে যায়। অন্ধকার কয়লার গুঁড়োর মতো। ঘুম অন্ধকারের মতো। অন্ধকার এখন দরকার নেই। ঝকঝকে আলো, বিয়ে বাড়ির আলোর মতো রঙ বেরঙের আলো, মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছে। সুর উঠছে। সানাইয়ের সুর। শাঁখ বাজছে। ছাঁদনাতলা, পিঁড়ি, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি। বর বড় না কনে বড়। সম্প্রদান, বাসর।

ঘুম আসছে। রমা মুখের সামনে হাত নাড়ল। যেন ওতেই তাড়ান যাবে অন্ধকার। বাসর ঘরে অন্ধকার কোথায়! ফিসফাস, শাড়ির খসখস, হাসি, একটা ত্নটো গান, ঠাট্টা, ছাদে হুড়োহুড়ি, গলিতে খুরি গেলাসের শব্দ, কুকুরের চীৎকার। সেন্টের গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, গা গুলোচ্ছে।

উঠে বসল রমা। জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কান্না, কান্না, কান্না। কনকাঞ্জলি, দুধ উথলানো, ল্যাটা মাছ ধরা, এবাড়ি-ওবাড়ির জানলা বারান্দায় অচেনা ভিড়, তারপর রাত পুইয়েই আর একটা দিন। তত্ত্ব আসবে, আবার হৈ চৈ, ছাদে ম্যারাপ, হাতভরা যৌতুক-উপহার, চেনা মুখ, সেণ্ট-ঘি'র গন্ধ। রাত বাড়বে। বাড়ি শান্ত, শরীর ভারভার, ঠাট্টা তামাসা, পা-চলে না, একটা ঘর, ফুল, ফুল, ফুল। নতুন তোশকের গন্ধ, পরিষ্কার চাদর, বন্ধ দরজা, কেউ হেসে ফেলল, আলো নিভে গেল। ফুল, ফুল, ফুল।

এখন ঘুম পাচ্ছে। কালকেই বিশ্বকে বলতে হবে একটা আলাদা বাড়ির

কথা। এ বাড়িটা নোংরা, নড়বড়ে, ঘিঞ্জি। আর কি! জানলায় পর্দা, একটা ভাল আয়নাতে নিজের মুখ দেখলে ভয় করবে না। সঙ্গে একটা যদি বারান্দা পাওয়া যায়! ফেরিওলা গেলেই চট করে ডাকা যাবে, পাশের বাড়ির সঙ্গে গল্প করা যাবে। দূর থেকে বিশ্বকে আসতে দেখা যাবে। আর কি? পাতলা চিনে মাটির কাপ। একটা ছেঁকনি। কলাই-চটা কাপে চা খেলে অসুখ করে, ন্যাকড়ায় চা ছাঁকলে বিশ্রী দেখায়। আর কি চাই! কি জানি, ঘুম পাচ্ছে। জুতো সাফ করার বুরুশ, ধোপাবাড়ির ফর্দ রাখার খাতা, আর, আর যদি একটা রেডিও হয়। রেডিও থাকলে ঘরটাকে ঝক-মকে দেখাবে। যমুনার কলের গান আছে। দুবার শুনলেই গানগুলো একঘেয়ে হয়ে যায়। যমুনা বলেছিল, সিনেমায় নাকি মেয়েরা বাগানে ফুল তুলে খোঁপায় গোঁজার সময় গান গায়। ও ভীষণ সিনেমা দেখে। অত দেখা খারাপ। কথাবার্তা, চালচলন কেমন যেন আলাদা ঢঙের হয়ে যায়। গেরস্থ ঘরে ওসব আর ক'দিন মানায়। কিন্তু তাই বলে সিনেমা দেখা কি বন্ধ থাকবে! মোটেই না। মাঝে মাঝে দেখব। কান্নাকাটির বইগুলো একদম দেখব না। যাবার সময় হেঁটে যাব। পাশাপাশি। আভা বলেছিল রাস্তায় বেরোলে ও ঘোমটা দেয় না, বোঝাই যায় না বিয়ে হয়েছে কি না। সিঁদুর খুব সরু করে দেয়। এতে নাকি সুবিধেই হয়, ছেলে-ছোকরারা খাতির করে। আমার খাতিরে দরকার নেই। ওতে নিন্দে হয়।

পাশ ফিরল রমা। এবার আর জাগা নয়। অনেক রাত হয়েছে। পাশের বাড়ির নির্মল-কাকার বৌ ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে কলতলায় নিয়ে গেছে। ঠিক ঘড়ি ধরে ওর সব কাজ। এরপর দুধ খাওয়াবে। নির্মলকাকা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। সকাল হতে আর ক'ঘণ্টাই বা বাকি। আর জেগে থাকা নয়।

গরম লাগছে। আহা রে। সানু হাতটা এমনভাবে ছড়িয়ে রাখে যে,—লেগেছে বোধ হয়। তবু ঘুম ভাঙল না ছেলেটার। সারাদিন যা দুপদাপ করে, ঘুমোলেই কাদা, ঘুমোলে ছোট ছেলেরা ভারী হয়ে যায়। বড় মানুষও হয় কি? ছেলেটা রোগা হয়ে যাচ্ছে। এখন বাড়ের সময়, ক্ষিদেও বাড়ে। ভাত খেতেই ওর যত অরুচি। আলুকাবলি আর চাটনি খেলেই কি শরীরে

মাস লাগবে। ওরই বা দোষ কি। যা বাজার আসে, সেই একঘেয়ে রান্না, বড়দেরই তো অরুচি আসে।

ঘুমের ঘোরে রমাকে জড়িয়ে ধরল সান্থ।

মুখের নাল চক চক শব্দ করে গিলে ফেলল ও। খরখর করে নেংটি ইঁদুর কি যেন করছে তোরঙ্গের তলায়। মুখে হুশ্ শব্দ করল রমা। সান্থ চমকে উঠল। রমাকে জোরে আঁকড়ে ধরল।

শিরশির করছে বুকটা যেখানে সান্থর মাথাটা ছুঁয়ে আছে। ওর একটু নিচেই চামড়াটা ছড়ে গেছে। একদিন বুকের কাছে, সান্থর মত এমনি করে নরম তুলতুলে কাদার মত কেউ হয়তো শুয়ে থাকবে। কচি দুটো হাত দিয়ে হাতড়াবে বুকের কাছটা, ছেলেবেলায় সান্থ যেমন করত। মা'র কাছে ও আর ক'দিন ছিল, আমিই তো বুকে-পিঠে করে এতো বড়টি করলুম। আজ মিছিমিছি ছেলেটা মার খেল চার আনা পয়সার জন্য। কেউ জানে না তোরঙ্গগুলোর পেছনে লুকনো কৌটোটার কথা। টাকা আড়াই বোধ হয় জমেছে। গুনতে গেলেই তো দেখে ফেলবে। কালকেই সান্থকে পয়সা দোব। না আর নয়। এবার ঘুম। সকাল থেকেই তো আবার কাজ। বিশ্ব চাকরি পাচ্ছে। বড় আশা, বড় কামনা করে লাভ কি। জীবন কি চায়। সুখ, নির্ঝঞ্ঝাট শান্তি, হাসি, গান, ব্যস্। বিশ্ব টাকা আনবে। ঘর বাঁধবে। আমায় নিয়ে সংসার করবে। এবার ঘুম। এবার শান্তি। এবার ঘুম। এবার অন্ধকার। আলো নিভল। ফুল, ফুল, ফুল।

॥ পাঁচ ॥

চেনাশুনো কেউ আছে কিনা খুঁজে বার করার জন্য এধার ওধার তাকাতে হয়। এতগুলো টেবিল চেয়ার, তাই চট করে চেনা মানুষদেরও খুঁজে বার করা যায় না। আলাদা করে প্রত্যেক টেবিলে নজর করতে হয়।

আবার প্রত্যেক টেবিলের লোকও, যখনই কেউ ঢোকে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। চেনা কাউকে দেখলে হাত তুলে জানান দেয়।

প্রথম দিন থেকেই চিনুর অস্বস্তি লেগেছিল এই খুঁজে বার করা ব্যাপারটায়। আজও ধাতস্থ হয়নি। সারা ঘরের লোক তাকিয়ে থাকে। অতগুলো চাউনি একপলকের জন্য হলেও বিব্রত করে। সকলেই বসে আর সে দাঁড়িয়ে, ফলে যেন সে একটু আলাদা হয়ে পড়ে। কিন্তু একবার বসে পড়লেই, সমান। আর আলাদা মনে হয় না।

চিনু যখন ঢুকল কেউ হাত তুলে জানান দেয়নি। ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা। দু'তিনটে টেবিল একদম খালি। আরগুলোয় দু'চারজন ক'রে।

অমল বসে ছিল একটেরেয়। দক্ষিণ দিকের জানলাটার ধারে। জানলা থেকে ঝুঁকে ট্রাম রাস্তা দেখা যায়। চেয়ার থেকে দেখা যায় আকাশ আর একটা কি গাছ যেন।

দুটি ছেলে কথা বলছে অমলের সঙ্গে। চিনুকে দেখে ওরা একটুক্ষণ চুপ করল।

—আমাদের কিন্তু খুব আশা ছিল আপনি একটা দেবেন।

—বললুম তো লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

—আবার লিখুন তাহলে। আপনারা যদি লেখা ছাড়েন,—

ছেলেটি হাসল। অমল বিরক্ত হয়ে চিনুর দিকে নজর দিল।

—তোকে খুঁজছিলুম। খুব দরকার আছে।

—তাহলে কবে নাগাদ আসব?

—বললুম তো, লেখাপত্তর ছেড়ে দিয়েছি।

স্বরটা রূঢ় শোনাল চিনুর কানে। ছেলে দুটি তবুও হাসল। নমস্কার করে চলে গেল।

—পত্রিকা বার করবে। ভগবান জানে কেন বার করবে। কবিতার জন্যে একটা পয়সাও খরচ করবে না। ভাবখানা এমন যেন ছাপিয়ে ধন্য করবে। লিখতে যেন খাটুনি নেই।

অনেকবার শোনা কথা। চিনু আলোচনাটা গায়ে না মেখে জিগ্যেস করল।

—দরকার কি বলছিলি !

—কিছু না, ওদের তাড়াবার জন্য বলেছিলুম।

—আর সব কোথায় ?

—আসেনি। ছটো টাকা আছে, মানে যোগাড় করে দিতে পারিস ? রেলওয়েতে লোক নেবে। একটা অ্যাপ্লিকেশন করব।

—কোথায় দেখলি, কাগজে ?

—হ্যাঁ।

অমল চুপ করে গেল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

—চিন্নু, তুইও একটা অ্যাপ্লিকেশন কর। পড়াশুনো যদি না করিস তাহলে এমন করে বসে থাকারও কোন মানে হয় না।

এটাও চিন্নুর অনেকবার শোনা কথা। আড্ডার হৈ চৈ-য়ের মধ্যে হয়ত কেউ বলেছে। কিন্তু আজকের শোনাটা একটু অন্যরকমের, কেন-না, অমলের বলার ঢঙ, সুর সবই আলাদা মেজাজের। চুপ করে রইল চিন্নু।

—এটা আমি ঠেকে শিখেছি। আর কিছু না হোক বি. এ. ডিগ্রিটার বাজার দাম আছে, সামাজিক মূল্যও আছে। তা তুই যতই নিজেকে পণ্ডিত ঠাওরাস না কেন। খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে তো হবে।

—কফি খেয়েছিস দেখছি।

চিন্নু টেবলের তিনটে কাপ দেখল। জল ভর্তি তিনটে গ্লাসও রয়েছে।

—হ্যাঁ, ওরাই খাওয়াল। কেন যে ওরা কাগজ বার করে !

এক গ্লাস জল খেল চিন্নু। একটি মেয়ে ছুটি পুরুষের সঙ্গে ঢুকল। কে যেন বলেছিল কলেজে পড়ার সময় ওর কী একটা খারাপ রোগ হয়। এখন পড়া ছেড়েছে, বাড়িতেও থাকে না। বাজি ফেলে ওকে চোখ দিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করেছিল অমল। এক কাপ কফি পেয়েছিল।

অমল তাকিয়েছিল উঁচুতে। স্কাইলাইটগুলো দিয়ে আলো এসেছে। কাচের ধুলো ছেঁকে নিয়েছে আলোর তীব্রতা। সাদা দেয়ালে ঘা খেয়ে কতটুকুই বা আর এতবড় ঘরের অন্ধকারকে দুর্বল করতে পারে। মেয়েটি তার সঙ্গীদের নিয়ে বসল চিন্নুর পিছন দিকে। অমল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল সামান্য, যাতে চিন্নুর দিকে তাকাতে গেলে ওদের না দেখতে হয়।

ঘাড় ফিরিয়ে চিনু পিছন দিকে তাকাল।

—কি দেখছিস।

—আজকের ছুটো নতুন মনে হচ্ছে।

—তা'তে কি হয়েছে?

অমলের সুরটা ঝাঁজালো। উত্তর দিতে পারল না চিনু। পা ছুটোকে আরো ঠেলে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসার মত করে বসল অমল। ঘাড়টা রাখল চেয়ারের পিঠের কানায়, হাত ছুটো বুকে।

—ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় একটা মেয়েকে ভালবেসেছিলুম। ওই বয়সেই বোধ হয় যথার্থ ভালবাসা যায়। মেয়েটার স্বাস্থ্য ছিল। একে দেখে মনে পড়ল।

—সাধারণতঃ তাই হয়।

—মোটাদের আমি ঘেন্না করি।

—তা অনেকেই করে, ওটা এমন কিছু একটা কথা নয়।

—এক সময় আমি ব্যায়াম করতুম। পাড়ার মস্তান ছিলুম। মেয়েটা আমায় পছন্দ করত। ওর বাবা জানতে পেরে ওকে খুব মেরেছিল। তারপর কোথায় যেন উঠে গেল। মেয়েটা ঠিকানা দিয়েছিল নতুন বাসার। চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতেও পারিনি। সে বছরই আই-এ ফেল করলুম।

থেমে থেমে, যেন নাটকের এক দীর্ঘ সংলাপ বলছে অমল। জানলার বাইরে থেকে চোখটাকে মাঝে মাঝে এনে ফেলছে চিনুর মুখে। টেবিলে খানিকটা চিনি পড়েছিল, তাই জড়ো করতে শুরু করল চিনু।

—পরের বছর পাশ করে আর পড়তে ইচ্ছে করেনি, বাবাই জোর করে কলেজে ঢোকাল। এখানে আর একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। দেখতে ভারি ভালো। মনে হত ও হচ্ছে পৃথিবীর শেষ মেয়ে যার মুখ শিশুর মত নিষ্পাপ। একদিন আমরা দোকানে চা খাচ্ছিলুম। ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামল। ও বলল, বৃষ্টিতে ভিজবে। সেদিনই সগু পাট-ভাঙা প্যাণ্ট পরেছি। রাজী হলুম না। তুই হলে কি করতিস?

—বলতে পারি না। অমন অবস্থায় না পড়লে কেউ বলতে পারে না।

—এখন যদি ঐ মেয়েটা বলে চলুন সিনেমায় যাই!

আঙুল তুলে অমল দেখাল চিনুর পিছনে।

—ছুটো মেয়েকে তুই এক করে দেখছিস!

—তাই নাকি! আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে। সেদিন আমার মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও রাজী হইনি। রাস্তাটায় একটা গর্ত ছিল। লেলাগু কমেটগুলো কাদা ছিটিয়ে যাচ্ছিল। পথচারীদের সে কি সাবধানী ব্যস্ততা! চিনু তুই আমাদের বাসাটা দেখেছিস?

—আগেরটা? না।

—ইঁদুরে কাটা কাগজের মত গন্ধ। একটা ঘরে বাবা মা ছয় ভাই বোন থাকত। আমি শুতুম ঘরের বাইরের রকে। পাশেই নর্দ্দমা। কুৎসিত আমাদের বেঁচে থাকাটা, তবু বেঁচে আছি। খুব সাবধানে বিপদ এড়িয়ে পথচলতি মানুষদের মতই। তবু বড় বড় বাসগুলোর মত এক একটা বিপর্যয় এসে নোংরা ছিটিয়ে চলে যায়। দেখে অন্যরা হাসে। এই হাসিটা আমি সহ্য করতে পারি না। মেয়েটাকে, নিষ্পাপ মুখ সত্ত্বেও, সহ্য করতে পারিনি। কেরানীর ছেলেদের বুদ্ধি অল্পবয়সেই পাকে, বুঝেছিলুম ওকে নিয়ে ঝামেলায় ভুগতে হবে, তাই অন্য একটা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই সরে পড়লুম। সেদিন ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, নেমন্তন্ন করেছিল যাইনি, রজনীগন্ধার ডাঁটা দিতেও তো পয়সা লাগে।

হাসল অমল, চিনুও। চুপ করে রইল ওরা। ঠুকঠুক করে টেবিলে চামচ ঠুকে কে ওয়েটারকে ডাকল। ছু তিনটে চেয়ার একসঙ্গে সরাবার শব্দ হল। চোখ বুজে অমল বলল:

—কাউকে ভালবাসলে মনে খচখচ করে, কি যেন অস্বস্তি হয়। কোথায় যেন একটা ভয় ধরে। ভয়টাকে বাধা দেবার মত জোর আমাদের কারু'র নেই। পৃথিবীর সব মানুষের মত আমিও রুগ্ন, তাদের মত আমিও একজন; তাই অসহ্য লাগে স্বাস্থ্যবান মোটাদের, ঘেন্না হয় দেখলে। ওরা এ পৃথিবীর যেন কেউ নয়। আসলে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই এখন বড় কথা। প্রেম-ফ্রেম পরের ব্যাপার।

চোখ খুলল অমল। ও যেন চোখ বুজলেই একটা অদৃশ্য বাইরের খোলা পাতা দেখতে পায়। আর গড়গড় করে তার থেকে পড়তে শুরু করে

দেয়। আড্ডায় ও কম কথা বলে। আজ শুধুমাত্র দু'জন। তাই কথা ছুটিয়েছে।

পিছন থেকে হেসে উঠল মেয়েটি। চিনু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। তখনও হাসছে। দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

—প্রেমে পড়লেই অনেক ভাবনা আসে।

চিনু বলল। বলার পিছনে কোন কিছুর তাগিদ নেই। চিনিগুলো টেবিল থেকে ফেলে দিয়েছে। হাতে এখন কোন কাজ নেই। পাশের খালি চেয়ারটায় পা তুলে দিল।

—হ্যাঁ, সে কোন মেয়েকেই হোক বা বৃদ্ধ, শিশু, গাছপালা, পিঁপড়ে যাই হোক। প্রেমের সঙ্গে কতকগুলো দায়িত্ব আসে, বোধ হয় বিবেক থেকে। এই বিবেকটিকেই এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের। ঝামেলা পোয়াতে যদি ভালবাসতুম তাহলে আরো আগে থেকেই চাকরির চেষ্টা করতুম। আমার মেজ বোনটাকে দেখেছিস তো, দেখলে কি মনে হয় ওর বয়স উনিশ! অপুষ্টির জন্যই অমন দশা। ফ্রক পরতে চায় না, ও আমার খুব প্রিয়, ইচ্ছে করে কাপড় কিনে দি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা দায়িত্বও ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে চায়। তখনই এই ভালবাসা, দয়া বা এই ধরনের জিনিসগুলোকে খারাপ লাগতে শুরু করে। পাড়ার একটা ছোকরা ওকে ভালবেসেছে। আমাদের বাসায় আসে, আমার বয়সী, আমাকে দাদা বলে। একদিন দেখি বোনটার সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে। ভাবলুম চড় কসাই, কসাতে পারিনি। কেন বলতো? ওরা কি অন্যায় করছিল!

—আর ভাল লাগছে না অমল। এবার ওঠ, একটু বাইরে বেরোই।

—বোস না, সিগারেট আছে?

—আছে।

—ক্যাপষ্টান?

—না। কাঁচি।

—দরকার নেই। দুটো আলোর রঙ লক্ষ্য কর। এই ঘরের মধ্যেরটা আর বাইরেরটা। সূর্য এখন কতদূর নেমে গেছে বাইরের আলো দেখে কিছুটা আঁচ করা যায়, কিন্তু ভেতরের আলো সেই একরকমই রয়ে গেছে।

কোনদিন বিকেলেই সূর্যাস্ত দেখা হল না। এতে কিন্তু কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না, কোনদিন আপসোসও করিনি। মনে হয়নি জীবন ব্যর্থ। এই ঘর থেকে বাইরের দিকে তাকালে নিজেকে মস্ত মনে হয়। আবার ওই স্কাইলাইটগুলোকে দেখতেও ভাল লাগে। বিকেলের আলোর একটা আলাদা রঙ আছে। ওই কাচগুলোর দিকে তাকালে তা ধরা পড়ে। এই ঘর থেকেই রঙটা দেখা যায়। অস্ত যাবার সময় সূর্যের আলো শুধু ওপর দিকেই পড়ে। আমার মনে হয় এ সময় সকলেরই ওপর দিকে তাকানো উচিত। কিন্তু কে দেখছে বল, কলকাতার মানুষ যন্ত্র হয়ে গেছে। যে যার নিজের তালে ঘুরছে। বলেছি তো খাওয়া-পরার তাগিদটাই সব থেকে বড় জিনিস।

—এবার আমি উঠব অমল। একঘেয়ে সুরের কথা আমার ভাল লাগে না। ঘুম পায়।

—তা হলে ঘুমো।

—ফাজলামি হচ্ছে?

চোখাচোখি হতে দুজনে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আলো জ্বালাচ্ছে ঘরের। অমলের মাথার ওপরেই সুইচ। চিনু উঠে জ্বালিয়ে দিল। মণীষ এল অফিস থেকে।

—দুটো টাকা দিতে পারিস?

—তোর খালি এক কথা।

—খুব দরকার।

—একে ট্রামের ভিড়, তার ওপর উদ্বাস্তু মিছিলে একঘণ্টা আটকা থেকে, এই সবে আসছি। একটু জিরোতে দে, তা নয় অমনি শুরু করেছিস?

চেয়ারে বাবু হয়ে বসল মণীষ। চিনু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মেয়েটি উঠে গেছে কখন সঙ্গীদের নিয়ে। অমল বাইরের দিকে তাকিয়ে। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে গাল দুটো। তার নাকটা ফুলে উঠল একবার ভারী নিঃশ্বাসে। চেয়ারের হাতলে আনমনে হাত বুলোচ্ছে।

চিনু মনে মনে হাসতে লাগলো।

ছুটির পর রোজ হেঁটে আসতে হয় দিনেশকে লালবাজার পর্যন্ত। ট্রামের বোর্ডে তখনও লেখা থাকে ডালহৌসি। ট্রামে ওঠার জন্য জোর লাগাতে হয়। বয়স হয়েছে। ছেলে-ছোকরারা ধাক্কা দিয়ে আগে উঠে যায়। ফার্স্ট ক্লাশেই ভিড়টা বেশি হয়। এর কারণ বুঝে উঠতে পারেনি দিনেশ। লোকের পকেটে কি বেশি পয়সা এসেছে, না মানসম্মান এত বেড়ে গেছে যে দ্বিতীয়টায় উঠলে খোয়া যাবে! পয়সা বেশি হলেই কেউ ফার্স্ট ক্লাশে চড়ে না। ক্লাশটা করা হয়েছে সামাজিক অবস্থার স্তরগুলোকে স্পষ্ট ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য। সুতরাং টাকা বাড়লেই সেটাকে জাহির করে সমাজে কিছুটা খাতির আদায় তো লোকে করবেই। তার মানে কি ফার্স্ট ক্লাশে যারা চড়ে তারা বেশ ধনী? তাও নয়, ধনীরা কি দুঃখে ভিড়ে গাদাগাদি ক'রে মরবে!

তাহলে ব্যাপারটা কি? দিনেশ ট্রামে উঠলেই রোজ একবার ক'রে ভাবে, লোকে কেন ফার্স্ট ক্লাশে ওঠে! সে নিজে দু'একদিন ফার্স্ট ক্লাশে উঠে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিল। কিছুই বুঝতে পারে নি। তারমত কেরানীরাও ফার্স্ট ক্লাশে চড়ে। সেকেণ্ড ক্লাশে ভিড় কম থাকলেও চড়ে না। এক পয়সা বাঁচানোর জন্য কলকাতার মানুষ কি বিরাট আন্দোলনই না করেছিল। এক পয়সারও আজ অনেক দাম। তাহলে ওরা কেন সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে না!

এর একটা কারণই সে খুঁজে বার করেছে। সেটা মান-সম্মানের কথা। সব গিয়ে মানুষ যেন এই একটি জিনিসকেই আঁকড়ে ধরেছে। দুটো পয়সাও আপাতত তুচ্ছ মনে হয়। পরিচ্ছন্ন পোশাক, গদিমোড়া সিট, ভদ্র হবার চেষ্টা, এগুলোতেও মন কিছুক্ষণ প্রসন্ন থাকে। দু'পয়সায় শুধু এটুকু লাভ! আর লাভের লোভেই এত ভিড় ফার্স্ট ক্লাশে।

এত ক'রে তবুও তফাতটা ঠিক ঘুচলো না। কি ক'রে ঘুচবে, মানুষগুলো যে এক। দুটো ক্লাশেই যারা ওঠে, রোজগারের দিক থেকে তফাতটা খুব বিরাট নয়। স্বভাব, মেজাজ, চালচলনেরও খুব তফাত নেই। এটা দিনেশ দুটো ক্লাশে চড়েই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এটুকু বুঝতে গিয়েও আবার ধাঁধাঁ লাগে। তফাত যদি নেই-ই তাহলে মানুষ সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে না কেন!

সেখানেও বোধ হয় ওই সম্মান বোধ কাজ করছে। যদি সকলের রোজগারই সমান হয় তাহলে কি ক্লাশ উঠে যাবে? শিক্ষা-দীক্ষা থেকে অহঙ্কার আসে। শিক্ষিতের মধ্যে কি স্তর ভাগ ঘোচান যায়? তফাত থাকবেই। অহঙ্কার থাকবেই। আইন করে ক্লাশ তুলে দিলেই কি অহঙ্কার ঘুচবে! ওটা ঘোচে ভেতর থেকে। যখন দেখবে শিক্ষায় বা রুচিতে পাশের মানুষটি খাটো নয়।

তাহলে মানতে হয় সেকেণ্ড ক্লাশে যারা ওঠে শিক্ষায় বা রুচিতে তারা ফার্স্ট ক্লাশের থেকে খাটো। এখানে রোজগারের কথাটা বড় নয়, এক রোজগারের মানুষের মধ্যেও অনেক তফাত থাকে। কিন্তু নিজেকে অশিক্ষিত ভাবতে কষ্ট হয় দিনেশের। রাগও হয়, ফার্স্ট ক্লাশে চড়া মানুষগুলোর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। অন্যকে বঞ্চিত করে সিটে বসার জন্য লোলুপতা ছুটো ক্লাশেই আছে। ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগই ছুটো ক্লাশ ছেড়ে দেয় না। ঝগড়া মারামারিতে কেউই অপটু নয়। তবু খাতির পায় ফার্স্ট ক্লাশে চড়া মানুষগুলো। মাধবীর মত গোটা সমাজটাই যেন অন্ধ হয়ে গেছে। দেখতে না পারলে বুঝবে কি! মান-সম্মান, টাকা থাকলেই দিতে হবে, এ নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এরা তা বোঝেনি। মাধবীর কাছে শিক্ষা-রুচির দাম নেই, টাকাটাই সব।

কিন্তু টাকাকে অবহেলা করার মত বুকের পাটাই বা কোথায়। তাহলে রমার জন্য অমন সম্বন্ধই বা আনলুম কেন? কোন্ রুচিতে এ কাজ করলুম! পরিবারের কথাটা মিথ্যে নয়। তার থেকেও নিজেকে নিরাপদ ভাবার কথাই বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ সব আগে বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচায়। অফিসে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে ছাঁটাই হবে। বুড়োবয়সে ছাঁটাই হলে ছেলে বৌ নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো। কোথায় থাকবে তখন মান-সম্মান। বিপদ কোথা থেকে যে হুড়মুড়িয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না। আগে থাকতেই বিপদ ঠেকাতে চেয়েছি। আর্থিক নিরাপত্তাকে জোরালো করতে চেয়েছি। তখন এত কথা মনে পড়ে নি। বাঁচার কথাটাই বড় হয়েছিল। মাধবীর কাছে এই কথাটা বরাবরই বড় হয়ে রয়েছে। ও সব সময় কেমন করে বাঁচা যায়, সংসারের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়া যায়, তার চিন্তাতেই ব্যস্ত। মান-সম্মানের কথা ভাবার সময়টুকুও দিতে পারে না। সেটা সম্ভব

হয়েছে মাধবী অশিক্ষিত ব'লে, কিন্তু নিজেকে অশিক্ষিত ভাবতে দিনেশের কষ্ট হয়, রাগ হয়।

টাকাকে অবহেলা করা যায় না। যাকে অবহেলা করা যায় না সেই মানী। ফাস্ট´ ক্লাশের লোক মান্যগণ্য। সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে যখন ফাস্ট´ ক্লাশে ডিউটি দেয়, তখন কণ্ডাক্টারদের ব্যবহারও বদলে যায়। হঠাৎ রোজগার বাড়লে মাধবীও কি তার ব্যবহার বদলাবে? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে টাকার ঠাঁই কতটুকু? সম্পর্ককে টাকা কতখানি ভাঙ্গা-গড়া করতে পারে?

ভিড়, ঘাম আর ময়লা কাপড়ের বোদা গন্ধের মধ্যে, রড্ ধরে দাঁড়িয়ে দিনেশ ভাবল, পরিবেশ যদি দমচাপা হয়, নড়াচড়ার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা যদি না থাকে, দুশ্চিন্তা যদি মাথায় ভর করে, তাহলে কোন্‌টে আগে ভাবা উচিত, টাকা-পয়সা, মানসম্মান, না শিক্ষা-দীক্ষা। কোন্‌টে আগে কোন্‌টে পরে হবে? একটার সঙ্গে অন্যগুলোর কি সম্পর্ক হতে পারে?

—টিকিট।

—তাই বলে গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? মুখে বললে কি শুনতে পাই না?

কণ্ডাক্টার মুখখানাকে নির্বিকার করে রাখল। লোকটা গাঁইগুঁই করে পয়সা দিল। দিনেশ তাড়াতাড়ি পয়সা হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে রইল।

—ঠেলবেন না।

—ইচ্ছে করে কি আর ঠেলছি দাদা।

—ঠেলাঠেলি যদি পছন্দ না হয় তা হলে ট্যাক্সিতে যান দাদু।

—অফিস টাইমের ট্রামে বুঝি নতুন!

মাথা গরম হয়ে উঠল দিনেশের। লোকগুলো সামান্য কথাটাকে নিয়ে অহেতুক ব্যঙ্গ করল। বাঙালী স্বভাবে ব্যঙ্গটা ভাল খোলে। তবু ইদানিং সেটা বেড়েছে যেন। অপরকে জ্বালা দিয়ে মানুষ আজকাল খুশি হচ্ছে। দিনেশ নিজের মধ্যেকার জ্বালা দিয়ে অন্যদের বুঝতে চেষ্টা করল। সে জ্বলছে এই মানুষগুলোর কথায়। এই মানুষগুলোকে জ্বালাচ্ছে কে?

—ঠিকই তো দিয়েছি। একটা আনি আর তিনটে নয়া পয়সা। মোট ছ'পয়সা হল।

—টিকিটের দাম দশ নয়া পয়সা। আনিতে হয় ছ' নয়া পয়সা তা হলে মোট হ'ল নয় নয়া পয়সা।

—গরমেণ্ট যা বলেছে আমি তাই দিয়েছি, এই তো পাঁচটা লোক রয়েছে, জিগ্যেস করে দেখ আমি কিছু অন্যায্য বলেছি কিনা!

—গরমেণ্টের কথা শুনলে তো আমার চলবে না; আমি কোম্পানির চাকরি করি, তাদের কথা শুনতে হবে।

—কোম্পানিতো বিলিতি!

—তা'তে কি হবে।

—গরমেণ্টের উপর কি তার হুকুম চলবে!

—অত কথা জানি না, আর একটা নয়া পয়সা দিন।

—দোবো না।

—তা হলে নেমে যান।

কণ্ডাক্টারকে চার পাঁচ জন বেধড়ক মারল। কাঠ হয়ে দিনেশ দেখল। তর্কটা হয়েছিল তার সঙ্গেই। নেমে যাবার কথা বলায় ভীষণ রাগ হয়েছিল। অপমানে গলা ভারী হয়ে, চোখে ঝাঁজাল বাষ্প জমে উঠেছিল। পাশের মানুষগুলো তর্কাতর্কি শুনছিল। এরপর ওরাও দু'চারটে কথা বলে। কথার পিঠে কথা হয়। সুর চড়তে শুরু করে। শেষকালে কণ্ডাক্টার মার খেল।

যারা মারল তারাই একটু আগে ব্যঙ্গ করেছিল। ট্রাম থেকে নেমে পড়ে হাঁটতে শুরু করেছে দিনেশ। ট্রাম থেমে গেছে। ভিড় জমেছে, পুলিশও এসেছে। সেই ফাঁকে সে সকলের চোখ এড়িয়ে কেটে পড়েছে। তাকে নিয়েই ঝগড়ার শুরু, সব আগে তারই খোঁজ পড়বে। এরপর থানা, পুলিশ, কোর্ট, ফাইন কিংবা জেল।

যারা মারল তাদের কি হবে! তারা মারতে গেল কেন? তাদের সঙ্গে তো তর্ক হয়নি। মারা উচিত ছিল আমার। আমায় অপমান করল তবু আমি কাঠ হয়ে রইলুম। মাধবী অপমান করে, তখনও চুপ করে থাকি। কণ্ডাক্টারকে অন্যলোকে মারল। আমারও ইচ্ছে করেছিল দু'চারটে চড় চাপড় মারি। তবু কেমন জবুথবু হয়ে রইলুম। এইটেই দোষ। আসল কাজের সময় কিছু করতে পারি না। ওরা আমার হয়ে করে দিল।

ওদের ফেলে আমি পালিয়ে এলুম। আমি কেন এলুম। অন্যায় করেছি? ওখানে গিয়ে যদি এখন বলি আমার জন্যই এই কাণ্ড ঘটেছে, আমিই আসল দোষী, তা হলে মহত্ত্ব দেখান হয়। কিন্তু যদি জেল হয়! আগে বুদ্ধিমান, তারপর মহৎ হওয়া উচিত। মহত্ত্ব আমার সংসারকে বাঁচাবে না। পয়সায় সংসার বাঁচে আর আমি একটা নয়া পয়সা বাঁচাতে ঝগড়া শুরু করেছিলুম। আসলে সংসারের মুখ চেয়েই মহৎ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। জন্মগত মহত্ত্ব গুণ বাজে কথা।

তবু কর্তব্য বলে একটা জিনিস আছে। আমি সেটা করিনি। ওরা আমার জন্যই মারল। ওদের জন্য আমার উচিত ছিল পালিয়ে না আসা। এখন যদি ফিরে যাই!

দিনেশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছি। ফিরতে গেলে ক্লান্ত হতে হবেই। ফিরে যাওয়া উচিত। শরীর ক্লান্ত লাগছে, বাড়িও বেশিদূর নয়। মাথা গরম হয়ে উঠল দিনেশের। হঠাৎ নজর পড়ল চাকরটার ওপর। একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছে ওপরে দাঁড়ান একটা ছোট্ট ছেলেকে। বেড়াতে বেরিয়েছে, বোধ হয় একটু পিছিয়ে পড়েছিল তাই একসঙ্গে রাস্তা পার হতে পারেনি। রাস্তাটায় ট্রাম, বাস দুই-ই চলে। কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে ছেলেটা। চাকরটার উচিত ওকে হাতধরে পার করে নিয়ে আসা, তা' না করে খিঁচুচ্ছে। হয়ত আড়ালে মারবে। মারের ভয়ে এখুনি অন্ধের মত ছুটে আসবে ছেলেটা।

ছুটে গিয়ে চাকরটাকে থাপ্পড় কষাল দিনেশ।

—উল্লুক কাঁহাকা। ওইটুকু ছেলে পার হতে পারে? তুমি বুড়োদামড়া পার হয়ে এসেছ বলে কি সবাই পারে?

আরও কয়েক ঘা লাগাল দিনেশ। ভিড় জমে গেল। সকলেই সমর্থন করল তাকে। পুলিশ এল না। চাকরটাই সরে পড়ল গুটিগুটি।

ভীষণ ঝরঝরে লাগছে এখন নিজেকে। মনে একফোঁটা গ্লানি নেই। চোখে পড়ল রাস্তার এমাথা ওমাথা পর্যন্ত টাঙান শালুটা। পুজো আসছে। রমাকে, মাধবীকে একখানা ক'রে শাড়ি দিতে হবে।

দিনেশ দু পয়সায় চারটে লজেন্স কিনে, একটা মুখে পুরল। শালুটা

হাওয়ায় ত্বলছে। পেছনের আকাশটা নীল। কতকগুলো ঘুড়ি উড়ছে। লাটালাটি চলছে ত্থটো ঘুড়িতে। দিনেশ ওদের শেষ দশাটুকু দেখার জন্য রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

ছাদে কাপড় শুকোতে দেবার সময় চীৎকার শুনেছিল মাধবী। ছাদের ধার ঘেঁষে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করেছিল। শৈলদের বাড়ির উঠোনটুকু ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। শৈলর ছ'টি ছেলে সারা সময় হুটোপাটি করে। একটিকেও উঠোনে দেখা গেল না। একবার চেঁচিয়ে উঠেই শৈল থেমে গেছল।

ত্বপুরে খাওয়া সেরে মাধবী শৈলদের বাড়িতে হাজির হল। ছেলেগুলো শুকনো মুখে তাকাল তার দিকে। শৈল রান্নাঘরের সামনে বসে আছে। উনুন জ্বলে যাচ্ছে। খুঁচিয়ে নামিয়ে পর্যন্ত দিতে ভুলে গেছে। রান্না হয়ে গেছল, ছেলেরা খেয়ে নিয়েছে। মাধবীকে দেখে ধড়মড় করে দাঁড়াল শৈল।

—চেঁচিয়েছিলি কেন ?

চুপ করে রইল শৈল। ছেলেরা গুটিগুটি কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাধবীর অস্বস্তি লাগছে। চেঁচাবার কারণ একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। কিন্তু সেটা কি ধরনের। হয়ত নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেছে। হয় বাবা নয় মা। সান্ত্বনা দিতে হবে। বাবা-মা মারা গেলে কতকগুলো বাঁধা গৎ আছে, আউড়ে যেতে হবে। আগে জেনে নিতে হয়, তাদের বয়স কত। প্রকৃতি কেমন ছিল, কি ভালবাসত, তাদের অবর্তমানে সংসারের কতখানি ক্ষতি হবে। না জানলে ঠিক বোঝা যায় না শোকটা কত গভীর।

—কি হয়েছে কি, অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

—উনি মরবেন বলছেন।

কথাটা বুঝতে যতটুকু সময় লাগে, তারপরই মাধবী ভেবে পেল না সে হাসবে না কাঁদবে। ছ' ছেলের মা হয়েও শৈলর বয়স আর বাড়ল না। এখনো তাহলে ওদের ঝগড়া খুনসুটি চলে। আছে ভাল!

—মরবে, তা মরুক না! অমন কথা ওরা অনেকে বলে, তুইও গ্যাঁট হয়ে বসে থাক।

বেশ লাগছে মাধবীর এখন নিজেকে। এই ধরনের কথাবার্তায় সময় কাটাতে সুখ আছে। বছর তিরিশ বয়স শৈলর। পর পর ছ'টা বাচ্ছার পর ফরসা রঙটা ফ্যাকাশে হয়েছে। কন্নুই আর গলার হাড়গুলোও ঠেলে উঠেছে। তাছাড়া মুখটা মিষ্টি, গালে এখনো টোল পড়ে। বয়সে শৈল অনেক ছোট, চিনুর থেকে দুচার বছরের বড়। মাধবী ওকে একই সঙ্গে সখি আর মেয়ে ভাবতে পারে। ঠাট্টা মস্করা করা যায় আবার ধমক-ধামকও দেওয়া চলে। সেদিন ইলিশ আসায় মাধবীর সর্বপ্রথমে মনে পড়েছিল শৈলকে। ওর সংসারে অনেকগুলো পেট। দিতে হলে অনেকগুলো দিতে হয়। নিজের সংসারের জন্য রেখে দাতব্য করা উচিত। তাই মাধবী বাধ্য হয়েছিল সেদিন শৈলর নামটা ভুলে যেতে।

—আজ আপিস যায় নি?

—না।

—ছুটি নিয়েছে?

—না।

—তবে!

—আর যেতে হবে না, চাকরি গেছে।

—কবে থেকে!

—ন'দিন হ'ল। ও বলছে মরবে। আজ সকাল থেকেই বলছে ডুবে মরব, নয়তো বাসের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

—তোর বাবা কোথায় রে?

—নিমাই জ্যাঠাদের রকে বসে আছে।

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে শৈল। ফাঁপরে পড়ল মাধবী। এখন সে কি বলবে। কেউ মারা গেলে তবু কিছু বলা যায়, কিন্তু এই কান্নায় সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। চাকরি কেন গেল, একথা জিগ্যেস করার কোন মানে হয় না। যে ভাবেই চাকরি যাক, এখন এই কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে শৈলর কি হাল হবে সেটাই বড় কথা।

শৈল কাঁদছে। মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলছে। ছেলেরা তাকিয়ে আছে।

—তুই কি বললি ?

—কি আর বলব।

—একটা মানুষ মরবে বলল, আর কিছু বললি না !

—কোন লাভ আছে ?

—ক্ষতি তো আছে।

চুপ করে রইল শৈল। মাধবী আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শৈলর স্বামী যদি মারা যেত তাহলে সে অনেক কথা বলতে পারত। কিন্তু মরবার ভয় দেখিয়েছে—এখনো মরেনি, সেক্ষেত্রে কি বলা যায় ! মানুষটা যদি না মরে তাহলেই অবস্থাটা কি বদলাবে ? গোটা সংসারটাই তো মরতে বসছে। চল্লিশ বছর বয়স হল শৈলর স্বামীর। এ বয়সে কি এমন কাজ জোটাতে পারবে। পেটে দুমুঠো ভাতই শুধু নয়, ছেলেগুলোকেও মানুষ করে তুলতে হবে। শৈলর কান্নাটা নতুন ধরনের। সান্ত্বনা দেওয়ার এখনো কোন বাঁধা গৎ তৈরী হয়নি। একটা মানুষ নয়, গোটা পরিবার মরতে বসেছে। এখনো মরেনি কিন্তু মরবেই তো।

—খেয়েছিস ?

চুপ করে রইল শৈল।

—না খেলেই কি মানুষের মন বদলায় ? নে, খেয়ে নে।

—ওর এখনো খাওয়া হয়নি।

—এই যাতো, বাবাকে ডেকে নি আয়।

পাঁচটা ছেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোটটা শৈলর কোলে গড়িয়ে পড়ল মাই খাবার জন্য।

—তুই ব'সে পড়।

—ও আগে আসুক।

এখন কাজ রইল শুধু শৈলর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। ঘষে ঘষে চোখের কোল লালচে হয়েছে। চোখের পাতা ভিজে। চটচটে হয়ে জুড়ে যাচ্ছে। ছোট হয়ে গেছে চোখ দুটো। মানুষের মুখের দিকে তাকান মানেই তার চোখের দিকে তাকান।

মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে রাখল মাধবী। একটা কিছু বলা দরকার এখন। কি বলা যায়। কথা আসছে না মনে। প্রাণপণে হাতড়াতে শুরু করল মাধবী। মনের এ-কোণ সে-কোণ থেকে এক টুকরো অভিজ্ঞতাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে একটা কিছু বলার মত কথা তৈরী হয়। এতখানি বয়স তাহলে কি দিয়ে গেল। এখনো কিছুদিন বাঁচতে হবে, অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেক অবস্থার মধ্যে নিজেকে পড়তে হবে, কিন্তু কি দিয়ে সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নোব! কেউ মরলে এক ধরনের সান্ত্বনা দেওয়া যায়। বাপঠাকুর্দার আমল থেকে তা চলে আসছে। কিন্তু এই নতুন ধরনের, সকলে মিলে মরার কি সান্ত্বনা? নতুন কথা তৈরী করতে হবে, কিন্তু একটা কথাও তৈরী করা যাচ্ছে না। অভিজ্ঞতা হার মানছে। ভয় ভয় করছে। ছোটবেলায় ভূতের গল্প শুনে, জানলা দিয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে একটা ছুটো তারা চোখে পড়লে যে গা-ছমছমানি ভয় লাগত অনেকটা সেরকম। শৈল একদৃষ্টে তাকিয়ে। পাঁচটা ছেলে, বাপকে ধরে আনতে গেছে। ছোটটা মাই খাচ্ছে। উনুনটা জ্বলছে খাঁ খাঁ করে। ভাত বাড়াই আছে। এর পর উনুন ধরবে না, ভাতের হাঁড়ি চাপবে না, বাচ্ছাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ঘ্যানঘ্যান করবে। শৈলর স্বামী হয়তো সত্যিই বাসের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে আর শৈল কি করবে?

হাতের ধাক্কায় বাচ্ছাটাকে ফেলে দিল শৈল। কেঁদে উঠল বাচ্ছাটা। ওকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মাধবী।

—তুই মাথা ঠাণ্ডা করে রাখ। এলেই ভাত খাইয়ে দিবি। ওসব পাগলামো চিন্তা করতে বারণ করিস। এটাকে নিয়ে যাচ্ছি, চুপ করলে পাঠিয়ে দোব।

উর্ধ্বশ্বাসে শৈলর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মাধবী।

মাধবী ঘরে নেই। রমা চুপি চুপি তিনতলায় উঠে এল।

ছাদেই ছিল বিশ্ব। জামা শুকোচ্ছিল। তুলে নিয়ে ঘরে ফেরার সময় রমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—টালিগঞ্জে গেছলুম। হঠাৎ এমন বৃষ্টি নামল!

—কই, এদিকে তো বৃষ্টি হয়নি।

—ওই তো মজা।

—টালিগঞ্জে কে আছে?

অফিসের এক বন্ধু। বেচারার কাল থেকে চাকরি থাকবে না।

—কি করে জানলে?

—ভেতর থেকে খবর পাওয়া গেছে। আরো দুতিন জনের চাকরি যাবে।

—কেন যাবে?

—ভগবান জানেন। কেন যাবে জানলে তো কোর্টে মামলা লড়া যেত। শুধু জানিয়ে দেবে তোমার চাকরির আর দরকার নেই। ব্যস, তারপর কলা চোষো। চল এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে।

—কেন বেশতো আছি।

—ঘরে চলো না।

রমার কনুই ধরে টানল বিশ্ব।

—কি হবে গিয়ে।

—কি আবার হবে, ব'সে ব'সে পরলোক-তত্ত্ব আলোচনা করব।

টেনে নিয়ে এল বিশ্ব রমাকে। আশা তার দেওরের বাড়ি বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরবে। বিশ্ব উঁকি মেরে দেখে নিল মা ঘুমোচ্ছে কি না।

দরজাটা ভেজিয়ে দিতেই রমা আপত্তি করল।

—ওটা খোলা থাক না।

—কেন!

—বন্ধই বা কেন করবে!

—একই ব্যাপার।

ব্যাপারটা বুঝেছিল রমা। বুঝে ভালই লাগছে। কিন্তু না বোঝার ভান করলে জিনিসটা আরো মিষ্টি লাগে। সময় কাটানোটাই বড় কথা, তার ওপর ফাউ এই মিষ্টি-মিষ্টি ভাবটুকু। কিন্তু আগেকার সময় কাটানোর থেকে এখন তফাত আছে। আগে যে অনিশ্চিত ভাবটুকু ছিল এখন আর তা নেই।

বিশ্ব চাকরি করে। বুক ঠুকে এখন সে সংসার পাততে পারে। এখন ও যে কথা বলবে তা' সত্যিকারের আন্তরিক। তার ওপর নির্ভর করা যায়।

উঠে গিয়ে রমা খুলে দিল দরজাটা। বিশ্ব ছুটে এসে কপাটটা চেপে ধরল।

—না, বন্ধ থাক।

—ধ্যেৎ, লজ্জা করে না।

—লজ্জা আবার কার কাছে!

মুখ ঘুরিয়ে রইল রমা। জানলা দিয়ে শুধু পাঁচিলটা দেখা যায়। এক'পা এগিয়ে গেলে আকাশটা দেখা যাবে। আকাশ দেখতে ইচ্ছে করল রমার।

দুহাতে জড়িয়ে ধরল বিশ্ব। আকাশ দেখতে ইচ্ছে করছে না এখন আর। নাকটা ঘষতেই বিশ্বর বুকের লোমে খসখস শব্দ হ'ল।

—সেদিন যা বলেছিলে তা ভুলে গেছ!

—কি বলেছিলুম।

—বারে, বাবার কাছে গিয়ে বলবে।

রমাকে ছেড়ে দিল বিশ্ব। কাঁধটা ঝুলে পড়েছে। ন্যাকড়ার পুতুলের মত হাত দুটো নড়বড়ে দেখাচ্ছে।

—কি হবে বলে।

—কেন?

—চাকরি থাকবে কিনা তার ঠিক কি।

—কেন থাকবে না?

—আমি তার কি জানি। দেখছি চোখের সামনে চাকরি চলে যাচ্ছে বিনা কারণে। আমার যদি যায়? যতক্ষণ না পাকা হচ্ছি ততক্ষণ আমার সঙ্গে একটা বেকারের কি তফাত? বরং বেকাররা আরো সুখী। তাদের আমার মত যন্ত্রণা পোয়াতে হয় না। কিচ্ছু করতে পারব না আমি। যাই করতে যাই না কেন একটা ভয় সব সময় তাড়া করে ফিরছে; যদি চাকরি না থাকে! কোন কিছুতেই আমি স্থির হতে পারছি না। নিজেকে এক মুহূর্তও নিরাপদ ভাবতে পারছি না।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেন স্বীকারোক্তি করছে বিশ্ব। ওর পেছনের জানলার রেলিংগুলো আরো মজবুত দেখাচ্ছে। জানলার ওপরেই আকাশ। রমার আকাশ দেখতে ইচ্ছে করছে।

চুপ করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। বিশ্বর মুখ দেখতে পাচ্ছে না রমা। আলোটা আসছে পিছন থেকে। রমা বলল ঃ

—তা হলে?

—জানি না।

—আমি কি করব?

—জানি না।

—এমন করে চললে আমি মরে যাব। আমি আর বাঁচব না।

—তা' আমি কি করব।

কালো দুটো টুনি যেন জ্বলে উঠল বিশ্বর আবছা অন্ধকার মুখে। ঝুলে পড়া কাঁধটা শান্ত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে সে রমাকে ছুঁল।

পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করা মাত্রই আঁচলটা টেনে ধরল বিশ্ব। বাধা না দিয়ে রমা শুধু শাড়িটা আঁকড়ে দেয়ালে লেপ্টে গেল।

—তুমি জানোয়ার হয়ে যাচ্ছ।

—জানোয়ারের হাতে পড়লে এতক্ষণে তোমার কিছুই থাকত না। আমি মানুষ।

—না, তুমি মানুষ নও।

দুপাশে হাত ঝুলিয়ে, খাড়া দাঁড়িয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল বিশ্ব। বুকের মধ্য থেকে বাতাসের এক একটা ঝাপটা মুখ আর নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বেরিয়ে আসছিল। আলো এসে পড়েছিল পিছন থেকে। পিছনে জানলা। জানলার ওপারে আকাশ। তখন আর আকাশ দেখতে ইচ্ছে করেনি রমার। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

—চিনু তুইও অ্যাপ্লিকেশন কর।

অদ্ভুত লাগছে চিনুর কথাটা শুনে। সাড়ে সাতটাতেও অফিস-ফেরত

ট্রাম বাসগুলোতে ভিড়ের কামাই নেই। হরেক রকমের পুরুষ-মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বাতাস দিচ্ছে। কাঁধের ওপর পত্ পত্ করল কলারটা। বুকে সেঁটে আছে জামাটা।

অমলের বুকটা ভীষণ সরু। আশ্চর্য ওর এখনো টি-বি হয়নি। ওর বাবাকে এখনো তিনটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। অমল থার্ড ইয়ারেই পড়া ছেড়েছে। কলেজে বেশ কবিতা লিখত, এখন মাঝে-সাঝে লেখে।

—চিনু তুইও অ্যাপ্লিকেশন কর।

—হবে কি কিছু?

—কিছু হবে না ভাবলে, সত্যিই কিছু হবে না।

করুণ সুরে প্রায় মিনতি করল অমল। চিনু তাকাল পুব মুখো। এদিকে বইয়ের পাড়া। ছোট-বড় বইয়ের দোকান। খুঁজলে দু' একটা লেখককে রাস্তায় পাওয়া যাবে। একজন আসছে, ওকে চিনু দু' দিন আগেই দেখেছে, অমলের মত গলা ক'রে বইয়ের দোকানের সেলসম্যানের কাছে আবেদন করছিল, খদ্দের এলে তার বইটাকে যেন আগে সুপারিশ করে। দুজনের বলার ভঙ্গিটা হুবহু এক। অমলের বাড়ির খবর চিনু জানে, ওই লেখকটির জানে না। এখন যেন জানা গেল।

—তুই কবিতা লেখা ছাড়লি কেন?

—কি হবে লিখে। এ্যাদ্দিন লিখলুম, দু'চারজন ছাড়া কেউ পড়েও না, চেনেও না। তাছাড়া পয়সাও পাওয়া যায় না। আমার পয়সার দরকার চিনু।

—তাই বলে কবিতা লেখা বন্ধ করবি কেন?

—ঈশ্বর, মেয়েমানুষ, সমাজ, অস্তিত্ব,—এই সবগুলোকে চুলচেরা বিচার করে, অনেক হীরে-জহরতই তো দেখলুম, কিন্তু একটাও গয়না গড়তে পারলুম না। আসলে তছনছ করতেই আমরা পারি, গড়তে পারি না। যদি নিজেকে গুছোতে পারি, জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারি তাহলেই একটা কিছু করতে পারব। সব আগে সংসারের ভাবনা থেকে রেহাই পেতে চাই, একটা চাকরি চাই। চিনু তুই আমার কথা শুনছিস না?

—শুনছি।

চিনু বাসের জানলা থেকে, চোখটা অমলের চোখে রাখল। জ্বলছে

চোখজোড়া। সারা মুখটাও। সরু বুক বাতাসের চাপে চুপসে যাচ্ছে আবার ফুলে উঠছে দ্বিগুণ হয়ে।

মুখ ফিরিয়ে চিনু আবার ডবল ডেকার দেখতে থাকল। অমল ভাবে নির্লিপ্ত না হলে কবি হওয়া যায় না। সংসারের কথা অত ভাবলে কি করে কবি হবে? কবিতে আর সাধারণ মানুষে তফাত কি? আমাতে আর অমলে কি তফাত? ও সুন্দর করে একটা কথা লিখতে পারে, আমি পারি না। গুছিয়ে কিছু করতে পারাটাই যদি কবি হওয়ার উপায় হয়, তাহলে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে যে লোক মরে সেও কবি। এযুগে কি কেউ নির্লিপ্ত থাকতে পারে? তার মানে কি, এযুগে বড় কবি জন্মাবে না!

—অমল হাঁটবি একটু।

—কোন্ দিকে, শ্যামবাজারে?

—হ্যাঁ।

—তুই মণীষের সঙ্গে গেলি না?

কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে চিনু বলল:

—ক্লান্তি লাগে। চিরকালতো আর এমন গা' ভাসিয়ে চলা যায় না; মেয়েমানুষের গল্প করেই সময় কাটল, কোন মেয়ে আর জীবনে এল না।

দুজনেই হাসল। অন্য ফুটে ভিড় কম। দুজনে রাস্তা পার হয়ে এল।

—চারটে পয়সা আছে? তাহলে আলুর চপ কেন্।

—দুটো আছে। ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে।

অমল আলুর চাপ কিনে আধখানা ভেঙে দিল।

—দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এই খাচ্ছি। ভীষণ ক্ষিদে পায়। রোজ পায়। মণীষটা আজ আধখানা কেকও খাওয়াল না। মিছিমিছি গালাগাল হজম করলুম।

অমলের আধখানা আলুর চপ খাওয়া দেখল চিনু। মুখেপুরে গিলে ফেলল, আবার তুলে এনে চিবুতে লাগল। চোখাচোখি হতেই হাসল চোখ বুজে।

—বেশ করে।

—তুই এটাও খা।

—নাঃ। কাল যখন বাড়িতে ঢুকলুম উনুনে হাঁড়িচাপান। বাবা তখুনি চাল কিনে এনেছে। বোনগুলো চুপচাপ ব'সে। দেখে কষ্ট হল। ভাবলুম বলি খাব না, বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। বলতে পারলুম না। ক্ষুধার্তের কানে নেমন্তন্ন শব্দটা ভয়ানক। খালি পেটে ডিম ভাঙার শব্দ শুনে দেখিস!

—এই নিয়েই তো লিখতে পারিস।

—তোর জানাশুনো টিউশনি আছে?

—না। পেলেতো আমিই করি।

—দুটো টাকা দিতে পারিস?

—কোথায় পাব টাকা।

—তবে এতটা পথ হাঁটালি কেন?

আর একটি কথাও না বলে অমল উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে দিল।

লজেঞ্চস ক'টা শেষ হয়ে গেছে। দিনেশ এধার ওধার তাকাল। রেলের গুদাম। মালগাড়ি। ভিখিরি। কতকগুলো ঝকঝকে পানের দোকান।

এধারে রেলিং, স্টীমারঘাট। ওপারে আলো। ডানদিকটা ঘুটঘুটে। বাঁদিকে আলোর সরলরেখা, হাওড়াপুল। নিমতলা শ্মশান, কুকুর, পুলিশ। পাগল। মড়াকান্না। মাংসপোড়ার গন্ধ। ভূতনাথের মন্দির। স্তোত্রপাঠ।

আর দুপয়সার লজেঞ্চস কিনে আনলে হয়। উঠবে বলে মন ঠিক করেও দিনেশ উঠল না। জোয়ার আসছে। ঢেউয়ের শব্দ হচ্ছে। সমুদ্র দেখিনি। এর কতগুণ বড় ঢেউ আর শব্দ সেখানে! অনেকদিন চান করিনি গঙ্গায়। বাড়ি থেকে বেশ দূরে, চান করে ফিরে আবার বাড়িতে চান করতে হয়। তবু ছোট বেলায় আসতুম। জেটি থেকে ঝাঁপ খেতুম। এখান থেকে উত্তরে আরো মিনিট দশ। হাঁটলে দেখা যাবে। যাবে কি?

আছে কি এখনো জেটিটা! একবার দেখে এলে হয়। অনেকদিন

আসি না গঙ্গায়। মা'কে পুড়িয়েছিলুম কাশি মিত্তির ঘাটে। বাবাকেও। সেই শেষ আসা। জেটি থেকে ঝাঁপ খেতে গিয়ে পশুপতি মারা গেল। জেটির তলায় শেকলে জড়িয়ে গেছল। সেদিন থেকেই গঙ্গায় চান করা হয়ে গেছে। পশুপতি বানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেসে গিয়ে উঠত বরানগর কি দক্ষিণেশ্বরে। এটা তার খেলা ছিল। সে মারা যেতেই ভয় পেলুম। গুরুজনের নিষেধ সেদিন প্রথম মান্য করলুম।

জলের ধারে নেমে এসে মাথায় জল ছিটোল দিনেশ। গাঁজা খাচ্ছে দুটো লোক। আর একটু ওপাশে গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে কেত্তন হচ্ছে। বুড়ী-গুলোকে এতদূর থেকেও ঠিক চেনা যায়। ওদের বসার কায়দাটাই অদ্ভুত।

বয়স হলে ধর্মকথা শুনতে ইচ্ছে করে। কেন করে কে জানে। ভয়েতে বোধ হয়। মৃত্যুর পর বিচার হবে ইহলোকের কাজ-কম্মের। বিচারে ঠিক হবে কে স্বর্গে আর কে নরকে যাবে। স্বর্গে খুব সুখ। শুনলে স্বর্গে যেতে লোভ হয়। বুড়োরা খুব লোভী হয়। খেতে আর গালাগালি দিতে ওরা খুব ভালবাসে।

আমি কি লোভী হয়ে পড়ছি! আমার কি বয়স বাড়ল? বাবু হয়ে জলের ধার ঘেঁষে দিনেশ বসে পড়ল। এখন ঘাড় ফেরালে তিন দিকে শুধু সিঁড়ি দেখা যাবে আর সামনে জল।

আমি কি বুড়ো হয়েছি? আমার কি সব ফুরিয়ে গেছে? ঘণ্টা-দিন-মাসের হিসেবে আমার শরীরের বয়স বেড়েছে। আর কি বেড়েছে? পৃথিবীটা একটু বদলেছে। আর কি? মানুষ!

আমাদের ছোটবেলার-দেখা মানুষ আর আজকের-চোখে দেখা মানুষে তফাত হয়েছে। পশুপতির বাবা নিমাই কাকা রাত্তিরে বাড়ি থাকত না। ভাইরা সম্পত্তি ঠকিয়ে নিল। ছোট ভাই কলেরায় মারা যেতে তার সংসারটাও যেচে ঘাড়ে নিল। নিমাই কাকা দেনা রেখে মরল। আজকের দিনে এমন গল্প শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না। নিমাই কাকা যখন মরে তখন আমাদের জোয়ান বয়স। সৎকার সমিতি ওকে পোড়ায়। দেখে কষ্ট হয়েছিল। জোয়ান বয়সের কষ্ট বড় বেশি অন্তরে বেঁধে। জোয়ান বয়সের সুখও বড় আন্তরিক।

চীৎকার করে হরিবোল দিল কারা! মুখ ফেরাল দিনেশ। মানুষ দেখা যায় না। রাস্তাটা বেশ উঁচুতে। আবার হরিবোল দিল। দিনেশ জলের দিকে মুখ ফেরাল।

কষ্ট হচ্ছে। মানুষ মরলে কষ্ট হয়। এ কষ্ট আমাদের সময়েও পেয়েছি। কিন্তু তফাত আছে যেন কোথায়। 'আমাদের সময়', এই কথাটা বলার কি মানে হয়? যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণই তো আমাদের সময়, আমার সময়। তবে কি বয়স বেড়েছে! না হলে তফাত গড়ে উঠবে কেন? সুখকেই মানুষ চায়। নিজের ভাবে। যৌবনের সঙ্গেই সুখের সম্পর্ক। বুড়ো বয়সে সুখ না পেলে মন তো যৌবনের দিকে মুখ ফেরাবেই। বুড়ো বয়সের এই দিনগুলোকে অস্বীকার করতে ইচ্ছে করে। জোয়ান বয়সই আমার সময়। আমার সুখের সময়। এ যৌবন আর ফিরবে না। আর ফিরবে না। সুখ আর আসবে না। আর আসবে না।

জলে পা ডোবাল দিনেশ। ঢেউয়ের ধাক্কায় শিরশির করে উঠল পা'টা। ছোটবেলায় ভয় করত। কামঠে নাকি পা কেটে নিয়ে যায়। টেরটিও পাওয়া যাবে না। যন্ত্রণাও হবে না। এমন নাকি অনেকের হাঁটু থেকে কেটে নিয়ে গেছে। কিন্তু এমন পা' কাটা একটা লোকও আজ পর্যন্ত দেখলুম না।

পা তুলে তাকিয়ে রইল দিনেশ। গোটাই আছে। আলতো হাত বুলোল। লোমগুলো লেপ্‌টে সরু দেখাচ্ছে, পা'টাকে অদ্ভুত লাগছে। যেন আর কারুর পা।

জেটিতে ভেড়ার সময় স্টীমারে অদ্ভুত এক শব্দ করে। শব্দটা একটুও বদলায় নি। ছোটবেলায় ঝাঁপ খেতুম স্টীমার থেকে। খালাসিরা দেখলেই তাড়া করত। ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়তুম দল বেঁধে। মাঝ গঙ্গা থেকে এক দমে পাড়ে আসতুম।

আজ আর পারব না। বয়স হয়েছে। ভয় করবে। তবু কতটা সাঁতরাতে পারব? দশ হাত। বিশ হাত। ওই নৌকোটা চলে যাচ্ছে, ওটা কি ধরতে পারব!

চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়। জোয়ার এসেছে। খাড়াই সাঁতরালে

ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ফিরে আসার দম নেই। জোয়ান বয়স হলে পারতুম।
এখন বুদ্ধি খাটাতে হবে। পোর্ট কমিশনার্সের টোলটার কাছ থেকে যদি
জলে নামি। অল্প সাঁতরে, ভেসে থাকলে স্রোতের টানে নৌকোটার কাছে
যেতে পারব। তারপর একটু সাঁতরালেই হালটা ধরা যাবে।

কাপড় জামা ভিজে যাবে। খুলে রেখে নামলে যদি চুরি হয়ে যায়!
অন্ধকার জায়গাটা চোর কি দেখতে পাবে? কি আর এমন পকেটে আছে।
তাছাড়া জল থেকে তো দেখাই যাবে। চীৎকার করলে চোর পালাবে।

ঠাণ্ডা লাগবে কি! বেশ ঠাণ্ডা জলটা। নিউমোনিয়া না ধরলেও সর্দি
হবে নির্ঘাত। জ্বর হতে পারে। অফিসে এ সময়ে ছুটি নেওয়া কি উচিত।
ছুটি পাওনা আছে তবুও কাজের চাপ পূজোর মুখেই বেশি। অফিসারকে
চটিয়ে লাভ কি। ছাঁটাইয়ের গুজব উঠেছে। কুড়ি বছর চাকরি করেও
রেহাই পায়নি এমন লোকও আছে।

নৌকোটা জোয়ারে গা ভাসিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। অস্পষ্ট
কতকগুলো ছায়া সমান তালে সামনে-পিছে দুলছে। দাঁড় টানছে। বোধ
হয় খুব তাড়াতাড়ি আছে।

আমার বয়স হয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি। হিসেবি হয়ে গেছি।
জোয়ান বয়স হলে কি এত ভাবতুম। সিধে সাঁতরে গিয়ে নৌকোটাকে ধরে
ফেলতুম। ভয়ে জলে নামতে পারলুম না। ভয়টা কি বুড়ো বয়সের, না কি
এই দুঃসময়ের। চিনু কি পারবে জোয়ার ভেঙ্গে সাঁতরাতে?

এ যুগের জোয়ানদের তাড়াতাড়ি বয়স বেড়েছে। দম ফুরিয়ে গেছে।
চিনু রেস খেলেছে। বিনা আয়াসে টাকা রোজগার করতে চায়। লড়বার
সাহস ওর নেই। লড়ে জিততে পারলেই সুখ। সুখ চিনু পেল না। ও
একদিন বুড়ো হবে। সেদিন অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হবে। আমার মতন
তখন হয়ত একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে ভাববে। কি ভাববে? আমাদের
সময়ে বেশি সুখ ছিল? কি করে বসবে চিনু। সুখ কোথায়। ওর বুড়ো
বয়সে ও কোন্ দিনের কথা ভাববে! জোয়ান বয়সেই হেরে বসে আছে।
পরিবেশে সুখ পাবে না। স্মৃতিতেও পাবে না। কি ভয়ঙ্কর দিন আসছে
ওর জীবনে! কেমন করে বাঁচবে!

আমি কি ভয় পেয়েছি? আমি কি হিসেবি হয়ে গেছি? ওই কেত্তনের দলে গিয়ে কি আমায় বসতে হবে? বৈরেগি হয়ে কি ওই গেঁজেল ছুটোর কাছে ধরনা দোব? আমি কি করতে পারি! আমার দরকার কি ফুরিয়েছে?

জল ছুটছে। উত্তর দিকে অন্ধকার, ওই দিকে জল ছুটছে। দক্ষিণে হাওড়ার পুল। গমগম শব্দ আসছে ট্রাম চলার। আলোর টানা লাইন। ওপারে আলো। লাউডস্পীকারের গান এপারেও শোনা যাচ্ছে। জেটিতে ভেড়ার সময় স্টীমারের বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ হচ্ছে। আলো পড়ছে জলে। জল ছুটছে। জলের আলো কাঁপছে। দিনেশ জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

ছোট্ট একটা ছেলে সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। দিনেশ ওর দিকে তাকাল।

কতটুকু আর, সাহুর বয়সী হবে। ফিতে দেওয়া জুতো, পায়ে মোজা। হাতে একটা থলি। কাপড় রয়েছে থলিতে। একা ও কেন জলের ধারে এল? পিছু ফিরে দেখল দিনেশ। কেউ নেই।

—কোথায় যাচ্ছ খোকা?

ছেলেটা একধাপ উঠে দাঁড়াল।

—কার সঙ্গে এসেছ?

—বাবার সঙ্গে।

—বাবা কোথায়!

থুতনি ঘুরিয়ে দেখাল ছেলেটা। ওদিকে নিমতলা শ্মশান-ঘাট। অনুমান করল দিনেশ, হয়তো কোন আত্মীয় মারা গেছে।

—ওতে বুঝি বাবার কাপড় আছে?

—না, মার জন্য লিচু।

—বেড়াতে বেরিয়েছিলে?

—না, মাকে দেখতে গেছলুম।

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—কি হয়েছে?

—অসুখ করেছিল।

দিনেশ তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল। সান্টুর বয়সী। কচি মুখ। মুখটা ফেটে যাচ্ছে। পলিমাটি যেমন চড়া রোদে ফেটে যায়। ঠোঁটের পাশ দিয়ে চোখের কোল পর্যন্ত আঁকাবাঁকা কতকগুলো ফাটল ধরেছে। গাল দুটো ডেবে গেল। চাপা শব্দ উঠছে গলা থেকে। জল জমেছে চোখে। খোসা ছাড়ান রসাল লিচুর মত ভাসছে চোখের সাদা অংশটা।

ওকে বুকের কাছে টেনে নিল দিনেশ। কাঁপছে শরীরটা। মুঠো দিয়ে চোখ কচলাতে শুরু করেছে।

—কি হয়েছে। কান্না কেন? কি হয়েছে!

—মরে গেছে।

ছেলেটা কাঁদছে। দিনেশ গলাটা ওর মাথায় চেপে ধরে পিঠে হাত বুলোতে লাগল। কি বলবে সে এখন। কোন কিছু বোঝার মত বুদ্ধি হয়নি। হাজার কথা বলেও একে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। চুপ করে রইল সে। ওর কান্না আর জোয়ারের শব্দ মিশে গেছে। বুকের মধ্যে কলকল করছে।

চুপ করল ছেলেটা। ওকে টেনে পাশে বসিয়ে দিল দিনেশ।

—খেয়েছ?

—না।

—খাবে?

—না।

—কখন মরে গেছে?

—বিকেলে। ইস্টিশনে লিচু কিনে, হাসপাতালে যেতেই একটা লোক বলল, মরে গেছে।

—কি অসুখ করেছিল?

—জানি না। অনেকদিন হাসপাতালে ছিল, তারপর পেট কেটেছিল।

—বাড়িতে কে কে আছে?

—বাবলু আর দিদ্‌মা।

—আর ?

—আর কেউ না।

—সঙ্গে কেউ আসেনি ?

মাথা নাড়ল ছেলেটা।

—গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে। আমিও ওই গাড়িতে এসেছি। খুব জোরে চালাচ্ছিল। একবার একটা লোক আর একটু হলেই চাপা পড়ত।

দিনেশের বুক থেকে মাথাটাকে দূরে সরিয়ে ছেলেটা মুখের দিকে তাকাল। ঝকমক করছে চোখ দুটো। গাল দুটো বেশ ফুলো-ফুলো।

—তোমার বাবা এখন কোথায় ?

—ওইখানে, অফিসে কি সব লিখছে, দাঁড়িয়ে আছে।

চুপ করল ছেলেটা। দিনেশ কূলকিনারা পাচ্ছে না, এখন কি বলবে। ছেলেটা তাকিয়ে আছে ঘাটের দিকে। ঢেউ এসে ওখানে শব্দ করছে।

—আমাদের বাড়িতে একটা ময়না আছে। আমি রোজ তাকে সন্ধ্যে-বেলায় ছাতু খেতে দি।

ঘাটে শব্দ হচ্ছে। দিনেশ শুনল। মালগাড়ির ইঞ্জিন হঠাৎ হুইস্‌ল্ দিল। ছেলেটা ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল। দেখা যাচ্ছে না। তরতর করে উঠে গেল। ইঞ্জিন দেখে আবার ফিরে এল।

—আমি যখন হাসপাতালে দাঁড়িয়েছিলুম তখন দু'টো দোতলা বাস গেছল। একদিকে গেছল।

—তুমি দোতলা বাসে চেপেছ ?

—হুঁ। ইস্টিশন থেকে তো দোতলা বাসে করে হাসপাতালে আসতুম।

এগিয়ে এসে দিনেশের কাঁধের ওপর ঝুঁকে ছেলেটা বলল।

—আমি একটা লিচু খাব ?

—খাও না।

দিনেশ নিজেই খোসা ছাড়িয়ে দিতে লাগল। ক্ষিদে পেয়েছে ছেলেটার। বীচিগুলো নিয়ে জলের দিকে ছুঁড়তে লাগল। খেলা করছে দুটো কুকুর। টিপ করে সেদিকে ছুঁড়ল। কেঁউ করে কুকুর দুটো পালাল। ছেলেটা হেসে উঠল।

শরীর গরম লাগছে দিনেশের। নখ বসে যাচ্ছে নরম মাংসে। হাত কাঁপছে। জল ছুটছে। ঘাটে শব্দ হচ্ছে। শান্টিংএর শব্দ হল। মন্দিরে জোর স্তোত্র পাঠ হচ্ছে। ছেলেটা ওপাশে সরে গেল কুকুর ছুটোকে খুঁজতে। দেখতে পেলে আবার বীচি ছুঁড়ে মারবে। হাসবে।

ওর কান্না দেখে বুকের মধ্যে কথাগুলো জমাট হয়ে গেছল। ওর হাসির আঁচে বুক গলছে। সারা শরীরে গরম ছড়িয়ে পড়ছে। হাত পা খেলাতে ইচ্ছে করছে। জোয়ান বয়সের জোর শিরার মধ্যে ছুটছে।

গঙ্গার জল ছুটছে। উত্তর মুখো জল ছুটছে। জোয়ার আসে সমুদ্র থেকে। দূরে অন্ধকারে কালো মত একটা কি নড়ছে। বয়া? অন্ধকারে বয়া থাকে না। নৌকো? তাই হবে। ওটাকে ধরা যায় তো!

—খোকা তুমি এখানে আছ তো? আমার কাপড় জামাগুলো একটু দেখ। একটা ডুব দিয়েই উঠে আসছি।

আণ্ডারওয়্যার পরে জলে নামল দিনেশ। আঙুলগুলো কুঁকড়ে গেল। কতদিন জলে পা ডোবে না যে! টান লাগছে পায়ে। পা সরে যাচ্ছে। ঠিক মত শরীরটাকে খাড়া রাখা যাচ্ছে না, টলমল করছে।

—সাঁতার দিতে পারেন?

সাঁতরালে ও খুশি হবে। ওর গলার স্বরে তারই জানান দিল। দূরে কালোমত কি একটা নড়ছে। ওটাকে ধরা যায় কি!

ঝাঁপিয়ে পড়ল দিনেশ। জলটা ঠাণ্ডা কনকনে নয়, শরীর জুড়িয়ে যায়। স্রোত চলেছে। গা ভাসালে হবে না। কাঁধে, বগলে চড়চড় করে উঠল মাংস। এককালে মেসিনের মত হাত চলত। জং ধরেছে। মুখে জল ঢুকছে। কুলকুচো করে ফেলল। আবার জল ঢুকছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভুল হচ্ছে। ডান হাত টেনে তোলার সময় মুখটা ডান দিকে ফেরাতে হবে। পাড়ি মারতে হবে সামনে। গুড়িগুড়ি ফেনা উঠবে! ডান হাত জলে পড়বে, মুখও জলে ডুববে, তখন শ্বাস ছাড়তে হবে। কত-কালের অনভ্যাস!

কোথায় সেই কালোমতন জিনিসটা! এধার ওধার তাকায় দিনেশ। কিছু নেই। জায়গাটা অন্ধকার। দূর থেকে কিছু একটা আছে বলে মনে

হয়। বুকে ব্যথা করছে। এখন যদি কিছুক্ষণ ভেসে থাকা যায়! না, তাহলে অনেক দূর টেনে নিয়ে যাবে।

চীৎকার করছে ছেলেটা। অন্ধকারে দেখতে পায়নি। ভেবেছে বোধ হয় ডুবে গেছে। দিনেশ চীৎকার করে সাড়া দিল। হয়তো কেঁদে ফেলবে। আহা কাঁদুক। ওর কান্না ভারি ভালো, ও কাঁদুক!

একটা লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ছেলেটার কাছে দাঁড়াল। কি যেন বলল, ছেলেটা ওর সঙ্গে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় দিনেশ ছেলেটাকে দেখল, তারপর গা ভাসিয়ে দিল।

যমুনা শনিপুজো দিতে যায়। মাধবী বলল আজ সে'ও যাবে। যাবে ভাল কথা। যমুনার কোন আপত্তি নেই তা'তে।

শৈলর ছেলেটাকে রমার কোলে দিয়ে মাধবী বেরিয়ে পড়ল। গরদের শাড়িটা পোকায় কেটেছে! যমুনার আটপৌরে শাড়ি দেখে গরদ না পরার ক্ষোভটা মিটে গেল মাধবীর। গরদ পরলে গিন্নি-বান্নি দেখায়।

অনেকগুলো মোড় ঘুরলে গলিটা পড়ে মাঝারি রাস্তায়, সেখান থেকে সিধে বড় রাস্তা। বাস চলে। সে রাস্তাটা পার হলেই শনিঠাকুরের মন্দির।

দুটো মোড় ঘুরতেই জমজমাট ভিড় পথ আটকাল মাধবীদের। চীৎকার করছে দু' একজন মুখে রক্ত টেনে, সকলে শুনছে। বেশি চেঁচাচ্ছে যে ছেলেটি তাকে মাধবী খুব ছোট অবস্থায় দেখেছে। ওর নাম দুলাল। দুর্গাপুজো কমিটিতে ওর নাম থাকবেই। ইলেকশনের সময় ভোট চাইতে এসেছিল। বাঁ হাতের দুটো আঙুল বোমা বাঁধতে গিয়ে উড়ে গেছে।

—প্রথমে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। কোবরেজ মশাইকে আমি বলেছিলুম ব্যাপার ভাল নয়। উনি তো বললেন পুলিশে জানিয়ে রাখ। আরে বাবা পুলিশ কি করবে! এসব কারবার যারা করে তারা কি অত সহজে ধরা দেবার পাত্তর। রইলুম তক্কে তক্কে।

—কি, কি হয়েছে রে দুলে!

বাজারে থলি হাতে মাঝ বয়সী একজন ভিড় কেটে তুলালের মুখোমুখি হ'ল।

—সেই মেয়েটা গুলোদা। বলেছিলুম না সেদিন চালচলন সুবিধের নয়। রোজ নতুন নতুন বন্ধু। বুঝি না কিছু যেন। আর ভদ্দর ঘরের মেয়েই যদি হবি, তার অত সাজগোজ কিসের! ঘরে বসে জানলা খুলে হিহি করে হাসা, দোকান থেকে চপ-কাটলেট আনা, এসব আসে কোত্থেকে? পুরুষমানুষ তো একটা বুড়ো অথর্ব বাপ। দিনরাত ঘরে বসে থাকে। সংসার চলে তাহলে কার পয়সায়? ওর ছোট বোনটাকে গোবরা জিগ্যেস করেছিল। এই নিয়ে রাস্তায় যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল। গোবরাটা ন্যাকা, আমি থাকলে ধুধ্বুড়ি ছুটিয়ে দিতুম।

যমুনা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সরু গলিতে অল্প কয়েকটা লোক জমলেই ভিড় হয়ে যায়। এখন গোটা পাড়াটাই ভেঙে পড়েছে। এমন হয় চোর ঠ্যাঙাবার সময়। আর হোত দাঙ্গার সময়।

মাধবী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে উঠল ঠিক কানের কাছে কার গলার স্বর শুনে।

—ঘোল ঢেলে লাথি মেরে বার করে দিক্। ভদ্দর পাড়ায় ব্যবসা খুলেছে, মাগির সাহসও কম নয়!

মাধবী ফিরে তাকাল। জানলার আধখানা কপাট খুলে একটি বৌ নিজের মনেই কথাটা বলল।

—নতুন এসেছে বুঝি?

—না দিদি, আজ মাস তিনেক হল আছে। আমার জানলা থেকে তো ওদের সবই দেখা যায়। রাত এগারটা, বারোটায় বাড়ি ফেরে রোজ। উনি একদিন রাত্তিরে ধর্মতলায় একটা পাঞ্জাবির সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছিলেন। মদ-টদও বোধহয় খায়। আচ্ছা আপনিই বলুন, এমন মেয়েকে পাড়ায় রাখতে আছে? উনি বলছিলেন হু'পা গেলেই তো আসল আড্ডা। সেখানে গিয়ে ঘর ভাড়া নিলেই তো হয়, ভদ্দর পাড়ায় থাকা কেন! কি বলুন?

—তা'ত ঠিক।

মাধবী ছোট্ট কথা বলে চুপ করে গেল। গলায় বোধহয় সূতিকার মাদুলি।

চওড়া সিঁদুর। টকটক গন্ধ বেরোচ্ছে শাড়ি থেকেই। ঘরটা অন্ধকার করা, ফলে ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তার ওপর জানলার আধখানাও ভেজানো।

—বেরিয়ে আসুন। আজ একটা হেস্তনেস্ত ক'রে তবে ছাড়ব।

—চেঁচালে বেরোবে নারে। মার, লাথি মার দরজায়।

—পুলিশে খবর দে'না!

—পুলিশ-টুলিশ দিয়ে কি হবে, আমরাই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মাধবী খুঁজল যমুনাকে। ভিড়ে কোথায় মিশে আছে। শনিপুজো দিতে যাবে, সে কথা কি ভুলে গেল!

—আপনি বুঝি এ পাড়ায় থাকেন?

—হ্যাঁ।

—কোন বাড়িতে?

—পঁচিশ নম্বরে।

—কটি ছেলেপুলে?

—তিনটি। দুই ছেলে এক মেয়ে।

—মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

—না। পাত্তর খুঁজছি।

—ভাল ছেলে পাওয়া আজকাল ভারি শক্ত।

দুজনেই চমকে উঠল। কে যেন দরজায় লাথি মেরেছে। ভিড়টা আঁট হয়ে উঠেছে। যমুনা কাছে এল মাধবীর।

—কি কাণ্ড দেখলেন দিদি। পাড়ায় থাকি অথচ এসব কিছু জানি না!

—এসব কি আর ঢাকঢোল পিটিয়ে কেউ জানায়।

ঘরের মধ্যে থেকে কচি গলায় কান্না উঠতেই বউটি সরে গেল জানলা থেকে।

—চল, পুজো দিতে যাবে না!

—যাব। আর একটু দাঁড়ান না।

—ওদিকে পুজো শেষ হয়ে যাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যমুনা পা বাড়াচ্ছিল। তখনই হটাশ্ ক'রে দরজাটা খুলে গেল। ভিড়টা দরজার কাছ থেকে একটু পিছিয়ে এল।

—কি পেয়েছেন আপনারা, দরজা ধাক্কাচ্ছেন কেন ?

সব চুপ। কতকগুলো মুহূর্ত কাটল। তারপর চীৎকার করল গুলোদা।

—এসব চলবে না ভদ্দর পাড়ায়।

—কি চলবে না ?

—কারবার করা চলবে না।

—মেরে তুলে দোব।

—আসল পাড়ায় ঘর নিন্ না !

—মা বোন নিয়ে আমাদের বাস কত্তে হয়।

আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সকলেই চীৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। যমুনার হাত ধরে মাধবী টানল।

—আর একটু দেখে যাই না।

—পূজোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদূর গিয়েই দরজা বন্ধের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মাধবী। বন্ধ দরজায় ওরা আবার লাথি মারতে শুরু করেছে।

দরজার ধার ঘেঁষে ঘোমটা দিয়ে কে একজন দাঁড়িয়েছিল, বয়স্ক মনে হয়েছিল। বোধ হয় মেয়েটির মা। মেয়ে যখন বলল, কি চলবে না ? তখন হাত ধরে টানছিল আর কি যেন বলছিল নিচু গলায়, ঘরের মধ্যেটাও একটুখানি দেখা গেছল, বুড়োমতন একজন বাটি থেকে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। মুখ তুলে কা'কে যেন কি বলল। একটা ফ্রক-পরা মেয়ে এসে ঠোঙা থেকে বাটিতে কি সব ঢেলে দিল।

—কাণ্ড দেখেছেন !

—হুঁ।

—কি দিন কাল পড়েছে যে।

যমুনা এরপর বকবক করে যাবে। যাকগে। কান না দিলেও চলবে। মাধবী রাস্তা চলতে সাবধান হল। জলের কল-মিস্তিরী রাস্তা খুঁড়েছে। ঢিপি হয়ে আছে। কথা বলছে যমুনা, বলুকগে। বারান্দা আর জানলা, কোন বাড়িরই খালি নেই। ওরা মজা দেখছে। খুশি হচ্ছে।

মাধবী ঠিক খুশি হতে পারছে না। ঘোমটাদেওয়া সেই মেয়েমানুষটি

আর বাটি থেকে খুঁটে খুঁটে-খাওয়া বুড়ো মানুষটির চেহারা মনে পড়ছে। ওরা মজা দেখছে। দেখবেই তো।

অনেক কিছুই ঘ'টে যাচ্ছে। এটাও একটা ঘটনা। ঘটনা আচমকা ঘটে না। কারণ থাকে। এরও একটা কারণ আছে নিশ্চয়। শৈলর স্বামীর চাকরী যাওয়াও একটা ঘটনা। কিন্তু এমন করে কি বারান্দা জানলায় ভিড় জমবে যদি শৈলর স্বামী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়! তফাত আছে ছুটো ঘটনায়। চাকরি যাওয়াটায় যতটুকু গুরুত্ব আছে তার থেকেও বেশি ভদ্র পাড়ায় একটা মেয়ের বেশ্যাবৃত্তিতে।

রাগ ধরছে মাধবীর। শৈলর কান্নাটা কেন গুরুত্ব পাবে না? পাড়ার লোকেরা এটুকুতেই কেন এত মাতামাতি শুরু করেছে। একটা মেয়ে তেড়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল আর একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে বসে কাঁদল। এ ছুটোয় তফাত কতটুকু? ছুটো ঘটনাই তো তৈরী হয়েছে একই কারণ থেকে। সংসারের কথা ছুটো মেয়েই ভাবে। ভাবনার ফলেই একজন কাঁদে, আর একজন রুখে দাঁড়ায়। ওপরে তফাত বটে কিন্তু ভেতরের কারণ এক।

কিন্তু একটা বেশ্যার সঙ্গে কি একটা ঘরের বৌয়ের, আসল জায়গায় কোন তফাত নেই? রাগ ধরছে মাধবীর। যারা মজা দেখছে, তারা কি ধরনের খুশি পাচ্ছে? ঘেন্না করছে। অন্যকে ঘেন্না করলে সুখ পাওয়া যায়। অনেক ধরনের সুখের মধ্যে এও একটা। সংসারে সুখ কোথায়! তাই ঘেন্না করতে হয়। টাকা পয়সা দিয়ে দিনেশ সুখ আনতে পারেনি, তার পাল্টা শোধ নিতে হচ্ছে ওকে ঘেন্না করে। তার মানে কি দিনেশও ঘেন্না করে বেঁচে আছে! আমরা কি পরস্পরকে ঘেন্না করি?

—দেখে পার হোন্।

হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল যমুনা। গাড়ি আসছে। ভয় করল মাধবীর। অতবড় বাসটা যে চালাচ্ছে তার হাতটা যদি একটু ঘুরে যেত! ছিটকে ধাক্কা খেতে হত আলোর থামটার সঙ্গে। মাথাটা ফেটে চুল আর ঘিলু মাখামাখি হত। কালো চাকায় রক্ত লেগে পানের ছোপ ধরত। ছিবড়ে ছিবড়ে মাংস রাস্তায় আটকে থাকত।

যমুনার হাতটা চেপে ধরল মাধবী। গাড়ির যেন আর শেষ নেই।

ওর মধ্যেই হাত ছেড়ে সাইকেল চালাচ্ছে একটা ছেলে। দেখলে বুক টিপ টিপ করে। মুখোমুখি গাড়িগুলো কেমন সাঁই সাঁই করে ছুটছে। ধাক্কা লাগছে না। ওরা নিয়ম মাফিক চলছে। তবু তো ধাক্কা লাগে, তখন সেটাকে বলে ঘটনা।

আমরা সব্বাই নিয়ম-মাফিক চলছি। এই চলাটা কোথাও বিগড়োলেই ঘটনা ঘটে। নিয়ম নিশ্চয় বিগড়েছে, নইলে বেশ্যা হবে কেন! চাকরি যাবে কেন!

আমি কি নিয়ম-মাফিক চলছি? আমার মধ্যে কিছু কি বিগড়োয়নি? স্বামীকে ঘেন্না করাটা কি পাপ নয়! আমি পাপ করেছি!

—কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব?

—নইলে কি গাড়ির তলায় যাবেন!

—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে না।

গাড়ির ভিড়টা পাতলা হয়েছে, মাধবীর হাত ধরে এক ফাঁকে ছুটে রাস্তাটা পার হল যমুনা। হাঁফিয়ে উঠেছে তুজনেই এইটুকু ছুটে আসতে।

—বাব্বা, রাস্তায় বেরোনোও দায়।

যমুনা হাসল। মাধবী পাল্টা না হেসে ফুট পাথের ধার থেকে সরে গেল। মস্ত একটা বাস আসছে।

পূজোর আদ্দেক সারা হয়ে গেছে! রাস্তার ওপর বেঞ্চিতে পুরুষরা বসে। ছোট্ট একটা ভিড় করে অনেকে দাঁড়িয়ে। মেয়েদের বসার জায়গাটা ভিতর দিকে। পুরুষ আর মেয়ের ভিড় সমান।

ওরা বসতেই অনেকে ফিরে তাকাল। মাধবী এখানে এই প্রথম। সব কিছুই নতুন লাগছে। পূজো করছে যে তার নামের একটা সাইন বোর্ড লম্বালম্বি ঝুলছে ঘরের মধ্যে। নামের শেষে অনেক কিছু লেখা। খুঁটিয়ে পড়ল মাধবী। মামলা জেতা, মেয়ের সুপাত্র জুটিয়ে দেওয়া থেকে বশীকরণের মাতুলি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

মানুষকে বশ করার জন্য মন্তর খাটাতে হয়! এতে মানুষের কোন্ জিনিসটা বশ হয়? দিনেশ যদি অমন একটা মাতুলি পরে তাহলে পারবে কি সে আমায় বশ করতে?

বিরক্ত হল মাধবী। পুজোরী হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করছে। শরীরটা অল্প কাঁপছে। কোমরের কাছে দুটো ভাঁজ দলমল করছে। কালো হয়ে গেছে কসি গোঁজবার জায়গাটা। সারা গায়ে লোম নেই। চশমা টপকে এধার-ওধার তাকাচ্ছে। যন্ত্রের মত পুজো করছে।

হাতজোড় করে আছে সকলে। বিড়বিড় করে ওরা কি বলছে। মাধবী নতুন মানুষ। সে দেখছে সব কিছুই।

শেতলা, মহাকালী আর শনি পাশাপাশি। নীচে শালগ্রাম আর শিবলিঙ্গ। শ্বেতপাথরের মেঝে। পাথরে অনেক কিছু লেখা। থালাভর্তি প্রসাদ। গরুর মত চোখ করে একটা লোক ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে।

পাশে তাকাতেই অস্বস্তি বোধ করল মাধবী। ওকে সে চেনে। খেঁদার মা। তিনবাড়ি ঝিয়ের কাজ করে। গলায় আঁচল জড়িয়ে হাতজোড় করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ওর সামনেই মোটাসোটা এক গিন্নী। হাত ভরা চুড়ি। নাকছাবিটাও দেখা যাচ্ছে। অস্বস্তিটা অল্প কেটে গেল। তবু খেঁদার মা'র গা বাঁচিয়ে সরে গেল মাধবী।

নতুন বিধবা বোধ হয়। ভঙ্গি থেকে এখনো সধবা ভাবটা ঘোচেনি। চুলটি বেশ কোঁকড়া। কুমারী বলে এখনো বিয়ে দেওয়া যায়। কাদের বৌ ও!

যমুনার দিকে তাকাল মাধবী। গদগদ হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর পাশের বুড়িটা চোখ বুঁজিয়ে ঝিমোচ্ছে। ঝিমোচ্ছে আর জাবর কাটার মত কি বলছে। বোধ হয় মন্তর। কি মন্তর!

বৌটির শাশুড়ী নিশ্চয়! নরম সরম গড়ন। বারবার বৌয়ের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। বৌটি মাথা নিচু করে কেন? বোধ হয় এখনো ছেলেপুলে হয়নি।

বয়স হয়েছে মেয়ে দুটোর। মুখের আদল এক রকমের। দুই বোন নিশ্চয়। তিরিশের কম কেউই নয়। এখনো বিয়ে হয়নি কেন!

ওই কি সতীন দত্তর ভালবেসে বিয়ে-করা বৌ! পোস্টাপিসে চাকরি করে। সতীন দত্ত অনেকবার জেল খেটেছে স্বদেশী ক'রে। পাড়ায় খাতির আছে, সামনের বার কর্পোরেশনের ভোটে নামবে। ওর বৌ এখানে কেন?

—পা ঢেকে বসুন।

খেঁদার মা কথাটা বলল। শান্তিজল দেওয়া হবে। মাধবী আঁচলে পা মুড়ল। ঘাড় হেঁট করে বসল সকলে। মুখে ছ'চার ফোঁটা পড়ল। মন্ত্র পড়ছে পুরুত। ছ'দিন অন্তর তাকে এই কাজ করতে হয়। যন্ত্রের মত তার প্রতিটি নড়াচড়া।

প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে খুঁটে বাঁধল খেঁদার মা। ছকুচি শশা আর একটা খেজুর পেল মাধবী। বাড়ির জন্য সে-ও রেখে দিল। সকলেই তাই করছে। এই জিনিসটা অদ্ভুত মনে হল তার কাছে। প্রসাদ সকলেই রেখে দিচ্ছে বাড়ির জন্য। একইভাবে সকলে ভাবে, সংসারের কথা ভাবে। একা সে-ই শুধু ভেবে মরে না। দুনিয়ায় সংসার শুধু একা তারই আছে তা নয়। ভাবাটা মানুষের ধর্ম। তবে বেশ-কম আছে। তা'থাক, তবু এতগুলো মানুষের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন দেখা যাচ্ছে। সান্ত্বনাও পাওয়া যাচ্ছে। নিজেকে সবাই সব কিছুর থেকে বেশি ভালবাসে। এদেরও ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। পাপ জমেছিল মনে। মনটা এখন হাল্কা বোধ হচ্ছে। এদের সঙ্গে আমার মিল আছে। এমন মিল হয়তো আরও মানুষের সঙ্গে আছে। ক'জনকেই বা দেখেছি। একটা বাড়ির ছুটো ঘরের মধ্যেই তো জীবন কাটল। বাইরে এলে নিজেকে কত বড়ো মনে হয়।

ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে মাধবীর আবার মনে হল, বাইরে এলে নিজেকে কত বড়ো যে লাগে!

—চিনতে পার গো!

—কেন পারব না। তোমার জামাইয়ের খবর কি, শুধরেছে না আগের মতই আছে?

—ও হারামজাদা আবার শোধরাবে। আজ ছ' বছর বে' হয়েছে, পরশু এসে বলে বে'র সময় আংটি দেবার কথা ছিল দাওনি, এখন দাও। আমিও তেমন মেয়ে কিনা। মেয়েকে যদি সুখে রাখতিস, আংটি কেন সোনার ঘড়ি পর্যন্ত দিতাম।

— মেয়ে কোথায়—তোমার কাছে?

—তবে না'তো কি! শাউড়ীটা খাণ্ডার মাগি। পাঠালে কি আর জন্মে মেয়ের মুখ দেখতে পাব। কোট-ঘর-পুলিশ, যে ক'রে পারিস নিয়ে যা দেখি। আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্তর নই।

এবার রাস্তা পার হতে হবে। মাধবী দাঁড়াল। খেঁদার মা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। যমুনা কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে। হাতভরতি চুড়িপরা গিন্নীটি খেঁদার মা'কে দেখে জিগ্‌গেস করল ঃ

—কি হলো গো আমার লোকের?

—চেষ্টা তো কচ্ছি মা, পেলে জানাবো।

—আর জানিয়েছ। মেয়েকে বসে বসে খাওয়াচ্ছ, আমার কাছেই দাও না। কি আর এমন কাজ আমার বাড়িতে! তিনটিতো লোক।

—না মা। জামাই শুনলে রাগ করবে।

—করে করবে। ভাত কাপড়তো আর দেয় না। যাই হোক বাপু তাড়াতাড়ি একটা লোক দিও।

গিন্নীটি চলে গেল। যমুনা এসে পড়েছে। খেঁদার মা গম্ভীর। মাধবী বলল ঃ

—কে গা?

—পাড়াতেই থাকে। হালে পয়সা ক'রে গাড়ি কিনেছে।

—তুমি বললে না কেন, তোমার মেয়ে হলে পারতে জামাইয়ের মত ছাড়া কাজ করতে পাঠাতে?

—কি দরকার মা ওসব বলে।

—না বললে যে আস্কারা পেয়ে যায়, মুখ বেড়ে ওঠে। দাঁড়াও, দেখে পার হও।

খেঁদার মা'র হাত ধরে মাধবী পিছিয়ে গেল। বাসটা চলে যেতে, এক ছুটে তিনজনে এপারে চলে এল।

গলির মুখে খুচরো দু'চারটে জটলা। জানলা বারান্দায় এখনো কেউ কেউ রয়ে গেছে। গলিটা অন্য যে কোন দিনের মত আবার মিইয়ে পড়েছে।

মাধবী বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। ভাঙেনি ওটা। ব্যাপারটা শেষ

পর্যন্ত কি ঘটল কে জানে। এপাশে সেই বউটির জানলা খোলা। থালায় ভাত বাড়ছে। মাধবীর ইচ্ছে করেছিল জিগ্যেস করতে। জানলার ধারে পৌঁছে আবার সরে এল। খেঁদার মা আর যমুনা কথা বলছে। গলা বাড়িয়ে মাধবী বলল ঃ

—ওখানে মোটেই সস্তায় তাঁতের শাড়ি পাওয়া যায় না। তার থেকে বরং ফেরিওয়ালাকে ডেকে দরজায় দরদাম করে কিনলে অনেক সস্তা পাওয়া যাবে।

শৈলর ছেলেটাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল রমার। সে দায় চুকিয়ে ফিরছিল, ডাকল আভার ছোটবোন।

—দিদি এসেছে, রমাদি।

—কখন রে ?

—দুপুরে, জামাইবাবুও এসেছে।

—আমার কথা জিগ্যেস করেছে !

—হুঁ।

একটা বাঁক ঘুরলে আভাদের বাড়ি। একবার ঘুরে এলে কেমন হয় ! বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তো ও আর হটহট করে পাড়া বেড়াতে পারবে না। গিয়েই দেখা করতে হবে। আজ এক বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে, বোধহয় ছেলেপুলে হবে তাই এসেছে। মধ্যে দু একবার এসেছিল দেখা হয়নি। শ্বশুর শাশুড়ী গ্রামে থাকে। ওরা এখানে ঘরভাড়া নিয়েছে। দু' জায়গায় সংসার-খরচ টানা সোজা ব্যাপার নয়। তবু গ্রাম থেকে আভাকে আনিয়ে সংসার পেতেছে ওর বর। কি নাম যেন, রবীন না সুবল !

সদর দরজায় হুটপাট শুরু করেছে বাচ্ছারা। বাটি হাতে কুলপিওলাকে ঘিরে চেঁচামেচি। আভার বর খাওয়াচ্ছে। আভাও দাঁড়িয়ে।

রমাকে দেখে খলবল করে উঠল আভা ঃ

—কি ভাগ্যি আমার।

—তোর না আমার।

ওদের কথা শুনছিল আভার স্বামী। কথার শেষ নেই কোন। হাবি-জাবি আলাপ। রমা হাসিমুখে কয়েকবার ওর দিকে তাকাল।

সুবল! নামটা এতক্ষণে মনে পড়ল। এমন হয়, অনেক কথা পেটে থাকলেও মুখে আসে না। আচমকা এসে যায়। তখন স্বস্তি লাগে!

—কেমন আছেন?

বেশ সহজ সুরে রমা জিগ্যেস করল। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে চট ক'রে সহজ হওয়া যায় না! কিন্তু অবস্থা বিশেষে হওয়া যায়।

আমতা আমতা ক'রে কিছু একটা জবাব দেবার চেষ্টা করল সুবল। শেষে বলল, মালাই খাবেন?

উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই ফরমাশ করল সুবল।

— খুব লাজুক না রে?

—তুই নতুন কিনা তাই।

—নতুন কোথায়! তোর বিয়ের সময় কতক্ষণ ধরে বকবক করেছি না!

মালাই বরফ এগিয়ে ধরল সুবল। রমা ইতস্ততঃ করছে।

—নে'না।

—বারে আমি একা খাব নাকি, তুইও নে।

—আমি তো খাবই। আমিই তো ডাকিয়েছি। সিদ্ধির খাবি?

রমাকে মালাই আর সিদ্ধির বরফ গোটাকতক খেতে হল। আভার বাবা-মা'ও বাদ গেল না। ছোটরা জামাইবাবুকে ঘিরে হৈ চৈ করছে। সুবলকে দেখে মনে হল এসব তার ভাল লাগছে।

দোতলার একটা ঘর মেয়ে-জামাইয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ও ঘরটা আভার আইবুড়ো কাকার। কাকা রাতে ঘুমোবে ছাদের ঢাকা দেওয়া চাতালটায়।

বাড়িতে সবাই খুশি। জামাই আজ রাতে থাকবে। ফিসফাস হচ্ছে আভার মায়েতে বাবাতে। ছোট ভাইটা গেছে পাশের বাড়ি থেকে ট্রামের মান্থলিটা চেয়ে আনতে। ও এলেই আভার বাবা নতুন বাজার যাবে। আর একটা ভাই মুদির দোকান থেকে ফিরলে জামাইয়ের লুচি ভাজা শুরু হবে।

রান্নাঘরে চা করছে আভা। রমা চৌকাঠে বসে শুনছে ওর কথা। চোখ দিয়ে দেখছে আভার শরীরটাকে, ভাবভঙ্গির খুঁটিনাটিকে।

—এই কদিনেই ওর অব্যেস পালটে দিয়েছি। এখন আমার হাতের চা ছাড়া একদম খেতে পারে না। তুই করে দে ঠিক ধরে ফেলবে। খাবে না, ফেলে দেবে।

—কেন আমরা কি চা করতে পারি না? দে'না, কেমন ধরতে পারে দেখি!

ছাঁকনিটা শক্ত করে আঁকড়ে কাপটা একটু সরাল আভা রমার নাগালের বাইরে।

—হ্যাঁ, শেষকালে চা ফেলে দিক। তারপর যত ঝাল আমার ওপর ঝাড়ুক। কম রাগী মানুষ! একটু এদিক-ওদিক হলেই একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

আভা হাসল। রমাও হাসল। তাই দেখে হঠাৎ ঘাড় নিচু করে চিনি গুলতে শুরু করল আভা।

—কাণ্ড যে বাধায় তা'ত দেখতেই পাচ্ছি।

—ধ্যেৎ, তোর বড় মুখ আলগা।

—দেশে থেকে যে কলকাতায় এলি? ওখানে বুঝি রাগারাগির সুবিধে হচ্ছিল না!

—আহা, তাই বটে। ও এখন যে দোকানটায় কাজ করে সেটাতো উঠে যাচ্ছে।

—সেকি!

রমার গলার স্বরে বাড়াবাড়ি ধরনের বিস্ময় ছিল। সে জানত, সুবল ঘড়ির দোকানের কারিগর। মাস গেলে প্রায় শ' দুই টাকা রোজগার করে। দোকান উঠে গেলে ওরা খাবে কি?

—উঠে যাচ্ছে চালাতে পারছে না বলে। ঘড়িতো আর তেমন বিক্রি হয় না। যা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে গরমেণ্ট, চালান আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মেরামত করে কোম্পানির আর কত আয় হয়, দোকান ভাড়া, কারিগরের মাইনে দিয়ে কোন লাভই থাকে না। তাই তুলে দিচ্ছে।

—তা হ'লে কি করবি!

—ওই জানে। নিজে দোকান দেবে, নইলে আর কি করবে! ঘড়ি, ষ্টোভ, কলম, সাইকেল—সব মেরামত করতে পারে। একটা ঘর পেয়েছে শেয়ালদার কাছে।

চা হয়ে গেছে। তুহাতে তুটো কাপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল আভা। আঁচলটা খসে পড়ল মাটিতে।

—তুলে দেনা রে।

—উহুঁ। ওমনি যা।

—মাথার কাপড় না দিয়ে গেলে মা ভীষণ রাগ করবে।

—করে করবে, বলবি আমি খুলে দিয়েছি।

—মা না থাকলে ঠিক দিতুম, বাড়িতে তো ঘোমটা দিলে ও রাগ করে।

—ভালই তো, বলবি, জামাই ঘোমটা দেওয়া পছন্দ করে না।

—তর্ক করতে পারি না বাপু, দিবি তো দে। আবার কাপতুটো নামিয়ে কাপড় ঠিক করতে হবে। নিচু হলেই ব্যথা করে।

হাসল আভা। এমন হাসি রমা কখনো দেখেনি। সুখী হয়েছে আভা। ভাবনা চিন্তা নেই। কিংবা থাকলেও গ্রাহ্য করে না। বরের সঙ্গে মনের মিল হয়েছে। আলাদা একটা ঘর পেতেছে। সুবল হাতের কাজ জানে, চাকরি গেলেও ভাবনা নেই। নিশ্চিন্তির সঙ্গে মনের মিল খাপ খেয়ে গেছে। শান্তিতে আছে আভা। ওর হাসিটা ঠাণ্ডা। দেখলে মন জুড়োয়।

আভার আঁচলটাকে ঠিকমত জড়িয়ে দিতে দিতে নিচু সুরে রমা বলল:

—বাপের বাড়িতেই খালাস হবি?

—ও বলছিল হাসপাতালে দেবে। সেটাই ভাল।

—হ্যাঁ, তাই ভাল। তবু প্রথম পোয়াতি, মা'র কাছে থাকলে সাহস পাবি।

—দেখি ও কি বলে। তোর খবর কি?

—আমার আর কি খবর।

—জুটল কিছু।

—তা দিয়ে তোর কি, তোর তো জুটেছে।

—তোদের বাড়ি যাব কাল। মাসিমাকে আচ্ছা করে বলে আসব'খন। তুই কিন্তু কালো হয়ে গেছিস।

ওদের কথা বন্ধ হল। আভার মা এসে পড়েছে। মেয়েকে তাড়া দিয়ে আবার ছুটল স্বামীর কাছে। কিসমিস আনতে বলা হয় নি।

রমা বাড়ি চলে যাচ্ছিল। আভা যেতে দিল না।

—এর মধ্যে যাবি। চ' কথা বলবি না?

—তোর বরটা বড্ড হাঁদা।

—আহা, গায়ে পড়া হলে বুঝি খুব ভাল হ'ত।

—হ'তই তো। তাহলে আইবুড়ি নাম খণ্ডাতে চেষ্টা করতুম।

—করে দেখ না একবার।

সুবলের শালা-শালী অনেকগুলো। ঘরে চুপ করে একা বসে ছিল সে। কেউ পড়ার বই, কেউ চটের আসনের নক্সা এনে জামাইবাবুকে দিয়ে পরখ করিয়ে নিচ্ছিল।

রমাদের দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সুবল। ওকে ভাল করে দেখল রমা। খুব সাধারণ দেখতে। মুখটায় ভোঁতামি সাধারণের তুলনায় একটু বেশি। আঙুলগুলো বেঁটে। হাতের হাড় চওড়া। পায়ের নখে ময়লা জমে। পেয়ালায় চা ঢেলে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে খেল'।

রমা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। কি কথা বলবে সে। মানুষটা কি ধরনের না জানলে আলাপটা শুরু করা যায় না। পুরুষদের কথার বিষয় যা হ'য় তা'তে বেশিক্ষণ মেয়েদের পক্ষে কথা চালানও শক্ত। ঘর সংসারের কথায় জোয়ান ছেলেরা তো একটুও রস পাবে না।

—কিরে খুব তো তখন বলেছিলি, এখন নিজেই তো লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলি।

—হলুম আর কোথায়। উনি আগে কথা বলুন। পুরুষদেরই আগে কথা বলতে হয়।

—তুমি বলতো কথা।

সুবল নড়ে চড়ে বসল। বার করেক হেসে, মুখ লাল করে শেষকালে ঘড় ঘড় ক'রে বলল ঃ

—এখন তো মেয়েদেরই যুগ। ট্রামে বাসে, পোস্টাপিসে, সিনেমায়, সব জায়গাতেই লেডিজ ফার্স্ট!

রমা তাকাল আভার মুখের দিকে। টকটকে মুখ।

—কথায় পারার জো নেই। একটু বেফাঁস কিছু বলেছি কি ক্ষেপিয়ে মারবে।

আভাকে এখন বেশ লাগছে রমার। এত কথা বলত না। এখন চোখে মুখে খই ফোটে। কথা বলে যাচ্ছে ও। সুবলের মুখের ভাব পালটে যাচ্ছে। সুবলের পদ্যের খাতা আছে। নিজহাতে মাংস রাঁধে। মাউথ অর্গ্যানে নিখুঁত গানের সুর তুলতে পারে। মেয়েদের একা রাস্তায় বার হওয়া পছন্দ করে না।

গানের মত লাগছে আভার কথাগুলো। মুখে হাসি রেখে শুনে শুনে গেল রমা। সুবলের দিকে তাকাচ্ছে আভা। চাউনিতে কি যেন আছে। সুখী হয়েছে ও। আগে ওদের পরিচয় ছিল না। কিন্তু এক বছরেই মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তরের ভাব। আভার ভয় ছিল স্বামী সম্পর্কে। সব মেয়েরই বিয়ের আগে থাকে। সুবল ওকে সুখী করেছে। সব চেয়ে বড় ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে। না খেয়ে মরতে হবে না। ছা-পোষা ঘরের মেয়ে এটুকুতেই সুখী।

চাকরি গেলেও সুবল ভয় পায় নি। হাতের কাজ জানে। দোকান দেবে। কিন্তু তার মানেই পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাওয়া নয়। খাটতে হবে। তখন ফাঁকি দেওয়া মানেই নিজে ফাঁকিতে পড়া। এখন ঘাড়ে দায়িত্ব পড়বে।

সুবল নিশ্চয় খাটতে পারে। এরপর তো ওকে আরো বেশি খাটতে হবে। আভার সঙ্গে যদি বিয়ে না হ'ত, তা হলে কি ও খাটবার, কিংবা দোকান দেবার জোর পেত? পে'ত নিশ্চয়। বিয়ে-না-করা দোকানদার কি নেই! তবু, খাটুনির জোরটা অমনি আসে না। বিয়ে করে যেমন দায়িত্ব এসেছে তেমনি আভা যদি না ওকে খুশি করতে পারত, তা হলে সুবল

কমজোরি হয়ে পড়ত। আর যে খাটতে প্যারে তাকে কোন দিক দিয়েই হারিয়ে দেওয়া সহজ নয়। তবে একথাও মানতে হবে, সুবল যদি খাটিয়ে না হত, তা হলে আভারও এত খুশি করবার জোর থাকত না। দুটো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব দুজনেরই।

—সিনেমায় যাবি ?

—না।

—চ'না। কি এমন কাজ আছে শুনি ?

—তোরা দুজনেই যা না। আবার মাঝে একজন কেন !

—খুব ন্যাকামো হয়েছে। যা দিকি চটপট সেজেগুঁজে আয়।

আভা একা নয়, সুবলও ওর সঙ্গে অনুরোধ জুড়ে দিল। মামুলি কতকগুলো আপত্তি করে রমা রাজী হয়ে গেল। আভা মাধবীর অনুমতি আদায় করার ভার নিল।

মাধবী তখন সবে বাড়ি ফিরেছে শনিপুজো দেখে। দিনেশ বা চিনু বাড়ি নেই। রমা যা ভাবেনি তাই হ'ল। আভার এক কথায় মাধবী রাজী হয়ে গেল।

রাত নটায় ছবি আরম্ভ। আভার ভাই বোনেদের নিয়ে দু'খানা ট্যাক্সিতে ওরা রওনা হল। মাকে যাবার জন্য পেড়াপীড়ি করেছিল আভা। ওর মা রাজী হয়নি। মেয়েদের সাধ আহ্লাদের ব্যাপারে বয়স্কাদের থাকতে নেই।

ছবি আরম্ভ হতে কিছু দেরি ছিল। সিঁড়ির পাশের একটা জায়গায় বসার ব্যবস্থা। তখনো সন্ধ্যার শো ভাঙেনি। ওরা সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সুবল চকোলেট কিনে আনল।

ছবিঘরটা ঝকঝকে সাজানো। এমন জায়গায় রমা প্রথম এল। অনেক মেয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের সে গোগ্রাসে দেখল। সাজগোজ ছাড়া কেউ সিনেমায় আসে না। তাই কাউকেই খারাপ দেখায় না। দেয়ালে ফটো সাজান রয়েছে। আভা উঠে গিয়ে দেখতে লাগল। রমারও ইচ্ছে করছে দেখতে। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ লাগল তার। এতগুলো মেয়ের সামনে দিয়ে উঠে গিয়ে, দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে হবে ওরা সকলে নিশ্চয়

তাকাবে তার দিকে। সকলের চাউনি বিশেষ করে তাকেই লক্ষ্য করবে, এ কথা ভাবতেই পা জমে যায়। অথচ আভা কত সহজে উঠে গেল। এটা সম্ভব হয়েছে আভার সিনেমা দেখার অভ্যাস আছে তাই, না কোন কিছুকে পরোয়া না করার জোর পেয়েছে বলে? রমা আভার দিকেই তাকিয়ে রইল।

হাতছানি দিয়ে আভা ডাকল। উঠে এল রমা। দু একজন তার দিকে তাকাল শুধু। আভা ছবির মানুষগুলোর নানান গুণপনার ব্যাখা শুরু করল। শুনতে শুনতে রমার নজর এড়াল না অনেক পুরুষমানুষই তাকে আড়ে আড়ে দেখছে।

ঘণ্টা পড়তেই তাড়া দিল সুবল। ওরা ভেতরে গিয়ে বসল, রমার পাশে আভা তার পাশে সুবল। দেয়ালের গায়ে ছবি। জমকালো পর্দা, ফিটফাট পোশাক পরা কর্মচারী, নরম চাপা আলো, চাপা কথার শব্দ, সব জড়িয়ে রমার স্নায়ুতে ঝিম ধরিয়ে দিল।

ছবি শুরু হতে অল্প দেরি আছে। সুবল আর আভা কানে-কানে কি বলে হেসে উঠল। রমা মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল, ওরা যাতে না অসুবিধা বোধ করে।

—এ্যাই, এদিকে দেখ্ না।

চাপা গলায় আভা ডাকল। চোখের ইশারায় রমাকে সে সামনের দিকে তাকাতে বলল। দু তিনটে সিট পরেই একটা লোক মুখ ঘুরিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে।

কি দেখছে লোকটা! মাথা নিচু করে ফেলল রমা। আভা আবার হাসছে। সুবলও।

—তোকে দেখছে।

—যাঃ, আমাকে নয় তোকে।

—বারে, আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

—হলেই বা, তোকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

আভা আবার সুবলের সঙ্গে কানাকানি শুরু করল। মুখ না তুলেই রমার মনে হল, সারা ঘরের লোক এখন তার দিকেই তাকিয়ে আড় চোখে দেখল, আভার আঙুলগুলো আলগোছে ছুঁয়ে আছে সুবল।

ঘাড় নামিয়ে রমা জিজ্ঞাসা করল ঃ আরম্ভ হতে আর কত দেরী রে ?

অমলটা চলে গেল, এর মধ্যেই বাড়ি ফিরে কি হবে। অভ্যাস হয়ে গেছে এমন যে এখন ভাত খেলে রাত এগারটা বারটায় ঠিক ক্ষিদে পেয়ে যাবে। অভ্যাসে অভ্যাস তৈরী হয়।

চিনু ফিরে হাঁটতে শুরু করল। পুজো আসছে এবার বোঝা যাচ্ছে। কলকাতায় এত মানুষ থাকে কি করে! থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়িগুলো আজকাল উঠে গেছে। ওই রকম ঘরে ঠাসাঠাসি হয়ে মানুষ থাকে। থাকে নেহাত খাওয়া-শোওয়ার জন্য। সে কাজ হয়ে গেলেই পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ে। গায়ে হাওয়া লাগায়। হাত পায়েব খিল ভাঙে। মেয়েদের অবস্থাটা কি হয় তাহলে! মা কিংবা রমাটা এখনো তবু দিনভর খাটে কি করে!

চিনুর মনে হল অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁটছে তবু কিছুই এগোয়নি। বিরক্ত হল সে। এতলোক এই কলকাতায় ভিড় করার কি দরকার। হাত পা খেলিয়ে দু'পা হাঁটা যায় না। ট্রাম-বাসে জামার ভাঁজ থাকে না। বাড়িতেও তিষ্ঠোন যায় না। তাহলে মানুষ করবে কি! পার্কে গিয়ে বসবে? একা অন্ধকারে বসার কোন মানে হয় না। ওরা যদি কেউ থাকত এখন!

ওরা থাকলেই বা কি এমন বসার মানে হ'ত? একঘেয়ে কথা, একই ভঙ্গিতে শোনা আর তাতে রসান দেওয়া, এ আব কতদিন চলে। এতে কি লাভ হয়? লাভ লোকসান খতিয়ে না চললে এ সময়ে টিঁকে থাকা যায় না।

তার মানে কি আমি টিঁকে নেই! লাভ লোকসান খতিয়ে চলিনি। তার মানে কি আমার কোন সঞ্চয় নেই ভবিষ্যতের জন্য? দু'বেলা বাড়িতে দুমুঠো খাই, তাছাড়া নোংরা গল্প, হাসিঠাট্টা, আর মাঝে মাঝে গম্ভীর সাহিত্য আলোচনা এতেই তো দিন কাবার হয়। এমনি করে অনেকগুলো বছর কাবার হয়ে গেল। তা'তে কি হল! কোনদিন তো মনে হল না আমি

কোন এক সময়ে সকলের থেকে বিশিষ্ট। আমার এমন কতকগুলো বোধ বা অনুভূতি আছে যা আর কারুর নেই। আমি নিজেকে ভালবাসলুম না, শ্রদ্ধা করলুম না, আস্থা রাখতে পারলুম না। মুহূর্তের জন্যও কি একবার মনে হয়েছে যে আমি টিঁকে আছি? আড্ডায় ব্যক্তিত্ব রেখে চলতে গেলে আড্ডা জমে না। দিনের পর দিন আড্ডা জমাতে গিয়ে সকলেই ব্যক্তিত্ব খুইয়ে পুঁয়ে পাওয়া হয়ে গেছি। ক্রমশ নিজেকে ক্ষইয়েছি। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি। আমায় দিয়ে কোন কাজ হওয়া কি সম্ভব?

পৃথিবীতে যদি কিছু অকেজো লোক থাকে তাহলে ক্ষতি কি? আড্ডা দেওয়াটা কি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই দরকার? মনের কুৎসিত চিন্তাকে বার করে দেবার জন্য কি খিস্তি করতেই হবে?

এর উল্টোটি যদি ঘটে তা হলেই বা ক্ষতি কি? আড্ডা বা খিস্তি না করে যদি কাজের মানুষ হই তা হলে কি যান্ত্রিক হয়ে পড়ব? বন্ধুরা ব্যঙ্গ করবে? এতে লাভ কার? আবার সেই লাভ লোকসানের কথা এসে পড়ছে। অন্য দিকে যদি ভাবি! এতে ক্ষতিটাই বা কি? নিজের কথা ছেড়ে দিলেও সংসারের কথা ভাবতে হবে। কোন দায়িত্ব নেই একথা ঠিক। কিন্তু যুক্তি দিয়ে কি মানবিক সম্পর্কের দায় চুকান যায়, পয়সার অভাবে মা যদি ঝিয়ের কাজ করে, তাহলে কি চোখ ঘুরিয়ে চিন্তা করব, এতে আমার কোন দায় নেই! বাবা যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে সেটা কি শুধু নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য! যুক্তির পরেও আরো কিছু থাকে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না কথা দিয়ে। অস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু স্বীকৃতিই বা দিই কেমন করে। সকলকে সুখী করতে হবে। অসুখী সংসারের মধ্যে একা কেউ সুখী হতে পারে না। সুখ আজকের দিনে টাকা ছাড়া আসে না। কিন্তু নিজে সুখী না হলে কি অপরকে সুখী করা যায়? যায় না। আমি নিজে যদি সুখ না পাই, নিজের ওপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না রাখি তা হলে আমার টিঁকে থাকাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। নিজেকে ভারী করে তুলতে হবে, যাতে এই পৃথিবীর ওপর ওজনটা বেশ ভাল করেই পড়ে।

—হাঁ করে দেখছ কি, জুতো কিনবে ভেবেছ নাকি! চলে এস।

চমকে ঘাড় ফেরাল চিনু। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে, লজ্জায় এতটুকু

হয়ে যাওয়া মুখখানা বিরক্ত ভদ্রলোকের পিছনে হাঁটতে শুরু করল। লজ্জা করল চিনুর নিজেরই। দোকানদার ওদের ডাকবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, সেও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। চিনুর সঙ্গে চোখ মিলতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল দোকানী।

শিরশির করে উঠল চিনুর শরীর। মহিলাটির লজ্জা অপমানে মেশানো অভিব্যক্তি আর দোকানদারের দরদ এক সঙ্গে জড়িয়ে ঘা দিচ্ছে। শরীরের ভেতরটা কাঁপছে। এমন জিনিস দেখা যায় না। যায়, চারদিকেই এমন ঘটে, দেখতে জানলে অনেক দেখা যায়। মানুষ দেখলে বোঝা যায় যে টিঁকে আছি। নইলে শরীরে এই কাঁপন এল কেন!

সারি সারি জুতোর দোকান। তারপরে কাপড়ের। প্রত্যেকটি শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে জিনিস দেখতে দেখতে চিনু একসময়ে একঘেয়ে বোধ করল। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল ট্রাম-বাস; লোকজনের হাঁটা চলা।

এ লোকগুলো সব কাজের। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে। হয়তো আত্মীয়বাড়ি যাচ্ছে, দুটো সুখদুঃখের কথা, হাসি-মস্করা করে নিজেকে হাল্কা করতে। অফিস থেকে ফিরছে কেউ হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে। পূজোর বাজার করতে বেরিয়েছে কেউ। সকলেরই উদ্দেশ্য আছে, অপরকে খুশি করে নিজেকে খুশি করা। তাহলে এতগুলো মানুষ স্বার্থপর! পৃথিবীতে বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থপরতা বলে কিছু আছে নাকি! সব মানুষই আগে নিজেকে ভালবাসে। আমি কি নিজেকে ভালবাসি? তাহলে বুঝতে পারছি কই যে আমি টিঁকে আছি!

কাজের মানুষ কাউকে কি দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোজ চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে! না বোধহয়। আসে, চা খায়, বন্ধু দেখলে দুচারটে কথা বলেই চলে যায়। কাজের মানুষের উদ্দেশ্য আছে। আমি কোন কাজই করি না।

ট্রাম-বাস, লোকজন দেখতেও বিরক্ত বোধ করল চিনু। আবার হাঁটতে শুরু করল। ওর সামনে চলেছে একটি পরিবার। মেয়েটি রমার বয়সী, ঝলমলে শো-কেসের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল। খেয়াল নেই যে কখন সে একলা হয়ে গেছে। কি একটা বলার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে, ঠিক চিনুকেই পিছনে

দেখে থতমত খেল। অজস্র লোক এই একটা ফুটপাথেই। অর্ধেকটা জুড়ে ফিরিওয়ালারা বসে গেছে। মুখ শুকিয়ে এধার-ওধার তাকাচ্ছে মেয়েটি।

—আপনার সঙ্গের ওরা ওইখানে, ফ্রক দর করছেন।

আঙুল দিয়ে চিনু একটা থাম দেখিয়ে দিল। ওখানে স্তূপাকার ফ্রক নিয়ে চীৎকার করছে দুটি ফেরিওলা। মেয়েটি হাসল একবার, তারপরই পড়ি মরি প্রায় ছুটে গেল।

দোষ নেই মেয়েটার। যা ঝলমলে সাজিয়ে রেখেছে শো-কেসগুলো! জোঁকের মত লেগেছে ছেলে দুটো। ওরা ঠিক তাক্ ক'রে ধরে। সঙ্গে মেয়ে থাকলে কখনো পুরুষদের কাছে ভিক্ষে চায় না। আশেপাশে হাঁটবে হাত বাড়িয়ে, কখনো পায়ে হাত দেবে। একটা পয়সা দিলেই বিদেয় করা যায়। তবু দিচ্ছে না লোকটা। দিয়েছে। খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। সঙ্গে কে, বৌ? বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। ভিখিরী দুটো তাকাচ্ছে। এবার আমাকেই ধরবে। কাছে পয়সা নেই বললেও বিশ্বাস করবে না। ঘ্যান-ঘ্যান করে জ্বালাবে।

ট্রাম রাস্তা পার হয়ে এপারে এল চিনু। কটা বাজে এখন? এতগুলো দোকান, ঘড়ি নেই একটাতেও!

—আসুন বাবু।

—না ঠিক আছে।

—ভেতরে এসে দেখুন না।

দোকানটায় ঘড়ি নেই। শো-কেসের মধ্যের জুতোগুলোর ওপর চোখ বোলাল চিনু।

—ভেতরে আরো ডিজাইনের আছে। আসুন না।

—এটার দাম কত?

—সাড়ে চোদ্দ।

—বিনুনি ছাড়া শুধু স্ট্র্যাপ দেওয়া ওই রকমের চটি আছে?

—আছে।

—ওই রঙের?

—না, শুধু কালো রঙের হবে।

পাশের দোকানের লোকটা ওদের কথা শুনছিল। চিনুকে নড়াচড়া করতে দেখেই ডাকল। হেসে তাকে ছাড়িয়ে হাঁটতে লাগল চিনু। ঘড়ি নেই। যাকগে সময় দেখে কোন লাভ নেই। বরং জুতোর দর করতে করতে সময় কাটান যাবে।

—আসুন বাবু।

—না ঠিক আছে।

—ভেতরে এসে দেখুন।

ভেতরে তাকিয়েই চমকে উঠল চিনু। কাবেরী জুতো কিনছে।

—না, ভেতরে যাব না। এইতো এখানেই কত রকমের রয়েছে।

—আরো অনেক ডিজাইনের আছে। ভাল করে বসে দেখবেন।

—জুতোর ভয়ানক দাম।

—কম দামেরও আছে। দর না পোষায় নেবেন না। তা' বলে দেখতে দোষ কি!

তিনটে বাক্স কাবেরীর সামনে। হাত নেড়ে কি বোঝাচ্ছে। বোধ হয় পছন্দ হয়নি। কতদিন ওকে দেখি না। পাঁচ-ছ' মাস! হাত নাড়াটা বদলায় নি। উঠেছে। এবার বেরিয়ে আসবে। দোকানদার কি বলল। দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে কি বলল। মাথা নাড়ল দোকানদার। ও এবার বেরোবে।

—ওমা, চিনুদা!

—আরে, তুমি এখানে কি কচ্ছ, জুতো কিনতে এসেছ?

—হ্যাঁ। বড্ড দাম। আপনি?

—আমিও। বড্ড দাম!

—চলুন, না, সস্তায় কোথাও থেকে কেনা যাক।

—চল।

তু' চারটে দোকানের শো-কেস দেখার পরই এদিকের জুতোর দোকান শেষ হয়ে গেল।

—চলুন, ও ফুটে যাই।

—ও ফুটে! আমি ঘুরে এসেছি, ভীষণ দাম।

—আপনি কি কিনবেন?

—আট-দশ টাকার মধ্যে যা হয়।

—আমিও তো তাই কিনব! পুজোর সময় কি এরা দাম বাড়ায়? এইটে কিনেছিলুম ন' টাকায় আর ঠিক এই জিনিসই চাইল সাড়ে দশ!

চিনু কথা না বলে শুধু তাকিয়ে রইল। কাবেরী এধার ওধার তাকাচ্ছে। ঘষে ঘষে ঘাড়ের ময়লা তুলছে। দু একজন ওদের লক্ষ্য করে গেল। শুধুই পাশ দিয়ে চলে গেল।

—চলুন দাঁড়িয়ে আর কি হবে। আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

—কোন ঠিক নেই। এগারোটার আগে তো বাড়ি ঢুকি না। তুমি কোন্ দিকে এখন, বাড়ি?

—বারে, বাড়ি কেন, হোস্টেল!

—হোস্টেল!

—হ্যাঁ, দিদি বলেনি?

—না'তো।

—আমিতো নার্সেস ট্রেনিংয়ে আছি।

—পড়াশুনো?

—আই-এ ফেল করেই ছেড়ে দিয়েছি। ঘরে বসে গুরুজনদের দুশ্চিন্তা আর কেন বাড়াই, তাই দুগ্‌গা ব'লে লেগে পড়লুম তো এখন।

—কি করে তুমি বুঝলে যে বিয়ের বাজারে তোমার দাম নেই?

—জানা আছে।

খোঁপার কাঁটায় চাপ দিতে দিতে ঘাড়টা কাত করে হাসল কাবেরী। হাসিটা অচেনা মনে হল চিনুর।

—বড় চা খেতে ইচ্ছে করছে।

চায়ের দোকানের খোঁজে এধার-ওধার তাকাল কাবেরী। ভয় ধরল চিনুর। বন্ধুরা যদি কেউ তাদের দুজনকে চা খেতে দেখে, তাহলে নিজেদের মধ্যে খিস্তির ঝড় বয়ে যাবে। বহুদিন নিজেকে এক মিথ্যা অশ্লীল গল্পের নায়ক হতে হ'বে। এখন যদি কেউ দেখে তবু বলা যাবে—দূর সম্পর্কের এক বোন, হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। অবশ্য এক সঙ্গে বসে চা খেলেও ওই একই সাফাই দেওয়া যায়।

কিন্তু তার থেকেও বড় ভয় চায়ের দামটা কে দেবে! নিশ্চয় আমাকেই দিতে হবে। তাই দেওয়া উচিত। কাছে পয়সা নেই বলা যাবে না। খালি পকেটে কি কেউ জুতো কিনতে আসে!

কি দরকার ছিল মিথ্যা বলার। ইচ্ছা ছিল না তবু মুখে এসে গেছল। ঘাবড়ে গেছলুম কেমন যেন। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল, কোন যোগসাজস ছিল না। তবু মনে হল, কাবেরী হয়ত ভাবতে পারে এটা হঠাৎ নয়। তাই কৈফিয়ত একটা মুখে এসে গেল। অমনি অমনি কৈফিয়ত আসে না নিশ্চয়। ওর সম্পর্কে আমার ভয় আছে। ওকে ভয় করব কেন? ওর সম্পর্কে কি আমি অন্যায় চিন্তা করেছি কখনো? ওর শরীরটা ভাল। ওর শরীর নিয়ে চিন্তা করেছি। কুৎসিত চিন্তা। অমন চিন্তা তো পথে-ঘাটে কতবার মনে হয়েছে। আবার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাবেরী সম্পর্কে তা হয়নি। শরীর ছাপিয়েও আরো বেশি কিছু গুণ ওর মধ্যে আছে। দেখতে মোটেই সুন্দরী নয়, তবু সব জড়িয়ে ও যেন কেমন। কিন্তু তাই বলে ওকে ভয় করব কেন! আমি কি কিছু অপরাধ করেছি? কাবেরীকে চিন্তা করার অধিকার নেই, ও আমার কেউ নয়, ওর সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা হবার কোন সুযোগ নেই, হলেও সেটা বৈধ ব'লে চালু-সমাজ-নীতি গণ্য করবে না। সমাজে বাস করি, ছোট্ থেকেই এই নীতির আওতায় বড় হয়েছি, অথচ গোপনে তাকে অস্বীকার করেছি। আমি অপরাধ করেছি। আমি অপরাধী সমাজের কাছে না কাবেরীর কাছে? সমাজকে দেখতে পাই না, কাবেরীকে পাই। তাই কি ওকে দেখেই মিথ্যা বললাম! কাবেরী কি সমাজ? গোটা না হলেও অংশ তো বটে। একটা মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা মানেই কি সমাজকে ছুঁয়ে থাকা? কাবেরীকে ভয় ক'রে কি আমি সমাজকেই ভয় করলুম? এমনি করে রোজই তো কত সামাজিক নীতিকে গোপনে অস্বীকার করছি। তার মানে অপরাধ করছি। অপরাধ-বোধের বোঝা মনের মধ্যে ঢিপি হয়ে উঠছে। মনের সুন্দর বৃত্তিগুলো চাপা পড়ছে, ধুঁকছে, মরে যাচ্ছে। এর থেকে উদ্ধার কোথায়। চিন্তাকে আমি ঠেকাবো কি করে। নীতিবোধ যদি না পাল্টায় তাহলে আমার সঙ্গে সমাজের ঠোকাঠুকি কি চলবেই। কিছুর সঙ্গেই নিজেকে মেলাতে পারব না। তার মানে কি চিরকালই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

—কি হ'ল, বললছি না চলুন!

—কোথায় যাবে?

—চায়ের দোকানে।

—চল।

খুঁজতে খুঁজতে একটা চায়ের দোকান পেয়ে গেল। দোকানটা ওদের জন্য মোটেই তৈরী ছিল না। চমক খেয়ে একটা টেবিল খালি হয়ে গেল। বাচ্ছাটার নড়াচড়ায় অনেকখানি ছেলেমানুষি ভাব এল। চেয়ার থেকে পা নামিয়ে কাপড়টা টেনে দিল ক্যাশ-বাক্সের লোকটা। ছাড়া ছাড়া কথা শুরু হল বাকি তুটো টেবিলে।

—কি আছে কি?

—চা, টোস্, মামলেট, বিস্কুট।

—আর?

—আর কিছু নেই।

—কি খাবেন?

—কিছু না, শুধু চা।

—খান না।

—না।

বাচ্ছাটা তবু কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিনুর বিশ্রী লাগল দোকানটা। ঘিঞ্জি, নোংরা। না ঢুকলেই হোত। বেরিয়ে যাবার পর লোকগুলো নিশ্চয় নোংরা আলোচনা শুরু করবে। চা'টাও বিচ্ছিরি। এখানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, অসুখ-বিসুখ আর জিনিসপত্রের দাম বাড়ার মত, নিরীহ বিষয় ছাড়া, অন্য বিষয়ে মুখ খুলতে পারে না।

মুখ বুজে চা খেল তুজনে। কথা হয়েছিল বাড়িতে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে। খাওয়া শেষ হতেই একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে কাবেরী দাম চোকাল। তার ধারণা হয়তো চিনুই দামটা দিয়ে দেবে। যেন আহত হয়েছে এমন একটা মুখের ভাব করল চিনু।

—কোন্‌দিকে যাবেন?

—তুমি কোন্ দিকে?

—ঠিক নেই, যেদিকে হয়।

—ফেরার কোন নিয়ম নেই!

—আছে। সাড়ে ন'টার পর সই ক'রে ঢুকতে হয়।

—এখন কটা?

—য'টাই হোক না। আপনার তো তাড়া নেই, চলুন না বেড়াই। সারাদিনে যা খাটুনি আর কিছু ভাল লাগে না।

মুখের দিকে তাকাল চিনু। চান করা তাজা মুখ। বোঝা যায় না যে শরীরের ওপর দিয়ে খুব খাটুনি গেছে।

--কি ভিড় দেখেছেন রাস্তায়।

—হ্যাঁ পূজো এসেছে তো!

—শুধু পূজো নয়, সব সময়েই এমন ভিড়।

—হ্যাঁ।

—একটু বসার জায়গা পর্যন্ত কোথাও নেই।

—কোলকাতাটা বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

—গোলদীঘিতে যাবেন?

—চল।

কড়কড়ে মাড় দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরলে এমন অবস্থা হয়। কাপড়গুলো ফুলে ফেঁপে থাকে, গায়ে লাগে না। মনে হয় শরীরটা আ-ঢাকা। অস্বস্তি হয় খুব। তেমনি অস্বস্তি লাগছে এখন। সম্পর্কটা শুধু আলাপের। বিশেষ কোন কাজেও আমি যাচ্ছি না। ও ডাকল, আমি না বললুম না। তবু অস্বস্তি! ওকে দেখে মনে হয় খুশি হয়েছে। আমারও খুশি হবার কথা। হচ্ছি না। গোলদীঘিতে গিয়ে যদি বসি তা হলে কি কথা হবে আমাদের। কাজ-কর্ম, সাহিত্য, বন্ধুবান্ধব, রাজনীতি? ওসব ভাল লাগে না। তা হলে আর কি বলার থাকে।

—আপনি এখন কি কচ্ছেন?

—আগের মতই আছি।

—চাকরি পাননি!

ওরা দুজন কথা না বলে হাঁটল কিছুটা।

—বি-এ পরীক্ষাটা তো দিতে পারতেন।

চিনু কথা বলল না। আরো কিছুটা হাঁটল দুজনে।

—আপনার একখানা বই আমার কাছে আছে।

—থাক। আমার আর দরকার নেই।

—ডিউটির পর যে সময়টা থাকে তাতে বাড়ি যাওয়া যায় না। যেতে ইচ্ছেও করে না। সংসার সেই একই ধরনের রয়ে গেছে। একটুও বদলায়নি। বাড়ি গেলেই আরো ক্লান্ত লাগে।

কাবেরীর গলার স্বরে চিনু বুঝল সত্যিই ওকে খাটতে হয়।

—তোমার আগে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল না?

হাসল কাবেরী। ব্লাউসের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ বার করে দেখাল।

—ওসব বাতিল করে দিয়েছি।

চিনু এবার লক্ষ্য করল, সাজগোজে বদলে গেছে কাবেরীর।

—তুমি বদলে গেছ।

—বদলাবো না?

পাল্টা প্রশ্ন করল কাবেরী। অবশ্য উত্তরটাও তারই দেবার কথা ছিল না। গোলদীঘি এসে গেছে।

— চিনেবাদাম খেতে কিন্তু বেশ লাগে।

—আমার একটুও ভাল লাগে না। একটা একটা করে ভেঙে খাওয়ার ধৈর্য আমার নেই।

—ছাড়ানোও পাওয়া যায়।

—না থাক। তুমি যদি খেতে চাও খেতে পার, আমি খাব না।

বাদাম না কিনে ওরা গোলদীঘিতে ঢুকল। একটা বেঞ্চও খালি নেই। ঘাসের ওপর এমন ভাবে লোক বসেছে যে নীচু সুরে ছাড়া কথা বলা যাবে না।

—কোলকাতাটা বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, একটুও বসার জায়গা নেই। চলুন আমাদের ওখানে।

—কোথায়, তোমাদের হোস্টেলে!

—হ্যাঁ, বসার জায়গা আছে।

হাসপাতালের বড় গেট ছাড়িয়ে মিনিট দুই তিন হাঁটার পর কাবেরী বলল ঃ

—ওই আমাদের হোস্টেল।

চার তলা বাড়ি। তিন তলাতেও বারান্দা আছে। চার তলায় নেই। মনে হয় ওটা নতুন হয়েছে। বাঁদিকের বাড়ির ছাঁচটা অন্যধরণের। বোধ হয় পরে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

—চার তলায় থাকি। ওই জানলাটা আমাদের ঘরের।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে কে গান করছে। চিনু শুনল। সুর শুনে বোঝা যাচ্ছিল না। কানে এল 'মহাবিশ্ব' আর 'করুণা' শব্দ দুটো। আঁচ করল রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

—ওই বাড়িটা কিসের?

—ডেলিভারি কেস ওখানে হয়। মাঝখানটায় নার্সারি। দোতলায় অপারেশন হয়।

—ওরা কোথায় যাচ্ছে?

সাদা পোশাকে গুটি পাঁচ-ছয় মেয়ে গল্পকরতে করতে চলেছে।

—ডিউটিতে যাচ্ছে।

একটা ট্যাক্সি এসে থামল। জমকালো শাড়ি-পরা একটি মেয়ে নামল, সঙ্গে পুরুষ।

—ও কে?

—প্রতিভাদি। হালে বিয়ে হয়েছে। রেজিস্ট্রি।

—ওরা কারা!

এক টুকরো মাঠের দিকে তাকিয়ে চিনু বলল। কয়েক জোড়া মেয়ে-পুরুষ বসে। মাঠটা আবছা। হোস্টেলের দেয়ালে একটা আলো আছে। তবে মাঠের অন্ধকার ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—চলুন ওখানে বসি।

—ওরা কারা?

কথা না বলে কাবেরী এগিয়ে গেল। চিনু পিছু নিল। হোস্টেল থেকে হাসপাতালে যাবার পথটা টালি দিয়ে ঢাকা। তার গায়েই এই মাঠটা।

মাঠের সামনে রেলিঙ। মাঝখানে দুটো ছোট্ট গাছের ঝোপ। অন্ধকারে গাছ চেনা যায় না। আলো থাকলেও চিনু গাছ চিনত না।

—কি বলছিলেন ?

—কিছু না।

ঘাসের ওপর মুখোমুখি বসল দুজনে। অবাক লাগছে চিনুর। এমন একটা জায়গাও তা হলে আছে। মেয়ে-পুরুষ জোড়ায় বসে গল্প করছে। নিজেদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত। অন্যের সম্পর্কে অসভ্য কৌতূহল নেই। কাবেরীর মত এরাও সারাদিন খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন দু'দণ্ড জুড়িয়ে নিচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিনু তাকাচ্ছে। কাবেরী দেখছে চিনুর ভাবভঙ্গি। দূরের একটা ওয়ার্ড থেকে মেয়ে গলায় কে চীৎকার শুরু করেছে।

—ওখানে কি হচ্ছে !

—হয়তো কোন পেসেন্ট। ও রকম প্রায়ই হয়।

চিনু এখানে নতুন, তাই উত্তেজিত হয়ে উঠল সহজেই। চীৎকারটা এখনো চলছে। মাঠের অন্য মানুষরা ঘাড় ফিরিয়েও তাকাল না। সকলেই ব্যস্ত। অন্যদিকে কান দেবার ফুরসত নেই।

এখানকার মানুষগুলো কি নিষ্ঠুর ? এই বীভৎস চীৎকারে কেউই চঞ্চল হ'ল না। অথচ আমি হচ্ছি। নাকি আমার কোন উদ্দেশ্য নেই বলেই চট্ করে বাইরের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে পড়ছি। এখানে যারা আছে তারা কেউই দরকার ছাড়া বসেনি। এ দরকারটা হাঁফ ছাড়ার জন্য। যতটুকু পারা যায়, সারাদিনের একঘেয়ে কষ্টের হাত থেকে কিছুটা বৈচিত্র্য ছিনিয়ে নিতে সবাই ব্যস্ত। চীৎকারে কে কান দেবে ? অথচ হয়তো, ওখানে একটা মানুষ মারা যাচ্ছে।

—চুপ করে আছেন যে !

—কি বলব।

—যাহোক্। ভাল লাগে না চুপ করে থাকতে। যাহোক কিছু বলুন।

চিনু ঘাড় নামিয়ে কয়েক মুঠো ঘাস ছিঁড়ল। বলার মত একটা কথাও মুখে আসছে না।

—মালা নেবেন দিদি ?

গামছায় তৈরী থলে হাতে, পাশে দাঁড়িয়েছে এক বিধবা।

—নিন্ দিদি একজোড়া। চার পয়সা ক'রে।

চিনুর দিকে তাকালও না। এখানকার মেয়েদের ও বোঝে। ফুল বড় নরম জিনিস। দু'দণ্ড জিরোবার জন্য যে মেয়েরা মাঠে এসেছে, তাদের কাছে এখন ফুল ভাল লাগবে।

দু'ছড়া রজনীগন্ধার মালা কাবেরীর সামনে ধ'রল। সরু সরু মালা। ওর দাম চার পয়সা হওয়া উচিত নয়।

দু'আনা দিয়ে মালা কিনল কাবেরী।

—হঠাৎ কিনলে যে !

—এমনি।

—বড্ড দাম।

—হোক্। গরীব মানুষ !

লজ্জা পেল চিনু। কাবেরী রোজগার করে। ওর সঙ্গে মনের তফাত হবেই।

মালাজোড়া দুজনের মাঝখানে, ঘাসের ওপর রাখল কাবেরী। ফুল বড় নরম জিনিস।

কা'কে দেখে, 'আসছি' ব'লে কাবেরী উঠে গেল। হেসে মহিলাটি কথা বললেন। তাকালেন কয়েকবার মাঠের দিকে। ফিরে এল কাবেরী।

—আমাদের স্টাফ্, অনিমা-দি। বাড়ি থেকে ফিরলেন। বেশ লোক।

—মনে হ'ল যেন আমার সম্বন্ধে কথা হ'ল।

—হ্যাঁ, জিগ্যেস করলেন কার সঙ্গে কথা বলছি।

—কি বললে ?

—বললুম আমার ভিজিটার।

—ভিজিটার কি ?

—বাঃ যারা দেখা করতে আসে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তারাই ভিজিটার !

—বাড়ি থেকে কেউ আসে না ?

—না, দরকার কি। আমিই তো বাড়ি যাই।

মালা দু'টো আঙুলে জড়াতে লাগল কাবেরী। দুটি ছেলেমেয়ে রেলিঙের ওপর এসে বসল। হোস্টেলের দোতলার বারান্দায় হঠাৎ ক'টি মেয়ে, হৈ চৈ করে কি একটা কাড়াকাড়ি করতে করতে আবার ঘরে ঢুকে গেল। এ্যাম্বুলেন্সের হেডলাইটের আলো মাঠটাকে ঝলসে দিয়ে ঘুরে গেল। টালির শেডের নিচে অনেকক্ষণ একাকী দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি মাথা নিচু করে হোস্টেলের দিকে চলে গেল। মুঠো-মুঠো ঘাস ছিঁড়ল চিনু।

—তাহ'লে তোমার কোন ভিজিটার নেই।

—না। আমার কোন ভিজিটার নেই।

হাতে মালা জড়ান বন্ধ করল চিনু। মুখ তুলে তাকাল সে আকাশের দিকে। কলকাতার সব আলোর ছাট গিয়ে লেগেছে আকাশে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ মিলেমিশে কোথাও চলেছে। মেঘের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কলকাতার সব আলো ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। আকাশটা কুচকুচে। আকাশটা এখন নরম নরম। আকাশটা এখন গভীর গভীর। আকাশটা এখন মস্ত বড়। আগাগোড়া দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যাচ্ছে ওটা বিরাট।

কাবেরীর হাতে ফুল। ফুল নরম। কাবেরী নরম। ওর থুতনি পায়রার মাথার মত। ওর ঘাড়ের বাঁকান ছাঁদটা কচি শশার মত। ওর গোড়ালি বাছুরের নাকের মত। ওর চুল মাকড়সার ঘন জালের মত।

ঘাড়ে একটা ব্যথা করছে। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে বেঁকে যাচ্ছে। গলার কাছে বাতাস জমেছে। সারা শরীরে নতুন ব্লেডে দাড়ি কামাবার আমেজ লাগছে। এখন আমি কাবেরীকে কি কথা বলব!

—তোমার খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কি খেয়েছ?

—এখানে যা দেয়।

—তুমি রোগা হয়ে গেছ।

এখন আমি কাবেরীকে কি বলব!

—তোমার সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে দেখা হল। ভাবতেও পারিনি। একদিন তোমার কলেজে গেছলুম, খুঁজতে।

—কবে!

—অনেকদিন হ'য়ে গেল।

—বাড়ি গেলেন না কেন?

আর কি বলব কাবেরীকে।

—আজ আমি জুতো কিনব বলে যাইনি। এমনি দর কচ্ছিলুম।

—কেনা তো দরকার।

—হ্যাঁ।

—জামাটাও ছিঁড়ে গেছে।

—হ্যাঁ। একটা কিনবো। পূজো না গেলে কাপড়ের দাম কমবে না।

—হ্যাঁ।

—ডিউটির পর কি তুমি একলা ঘুরে বেড়াও?

—হ্যাঁ।

ঝমঝম করে কোথায় ভারি কড়া নাড়ার শব্দ হল। উঠে দাঁড়াল কাবেরী।

—এবার চলি।

—যাবার সময় হল?

—আমাদের আর বাইরে থাকার নিয়ম নেই।

--আচ্ছা যাও।

—ওই পর্যন্ত চলুন।

হোস্টেলের দরজার কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। আরো অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কথা যেন এখনো ফুরোয় নি।

—আসবেন না আর?

—আসবো। তোমার কি রোজ এই সময় ছুটি থাকে।

—না, তবে কাল ছুটি আছে।

—আসবো। আজ চলি।

—এটা নিয়ে যান।

একটা মালা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে এগিয়ে ধরল কাবেরী।

চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকাল চিনু। কেউ জানে না কি আছে ওর মুঠোতে। চিনু হাত বাড়িয়ে দিল।

ভারী লাগছে। গোটা শরীরটা টলমল করছে। পা পড়ছে না ঠিক-মত। আমি ফিরছি। আমার ফেরার একটা অর্থ আছে। কিছু একটা করে ফিরছি। আমি কি করলুম! কি উদ্দেশ্য পূর্ণ হল? এতে সংসারের কতটা লাভ হবে? চুলোয় যাক লাভ লোকসান।

আকাশে একটা আলো। কলকাতার সব আলো। কলকাতাটা ভীষণ সুন্দর। মানুষ কেন এই সময় আকাশের দিকে তাকায় না। উচিত। অমল ঠিকই বলেছিল, প্রত্যেক মানুষ যেন আকাশের কথা ভাবে। নরম নরম। গভীর গভীর। মস্ত বড়। বিরাট। আকাশকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। আকাশকে দেখলে বিশ্বাস হয়। আকাশের দিকে তাকাবো।

এখন কোথায় যাই! পয়সা নেই, হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি অনেক দূর। কটা বাজে? যটাই বাজুক। আজ তাড়াতাড়ি ফিরব। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমোব। কিন্তু তার আগে সেই লোকটার কাছে যেতে হবে। ও চেষ্টা করলেই কণ্ডাক্টারীর চাকরিটা হয়ে যাবে। এত রাতে গেলে কি রাগ করবে? করুক, গরজ আমার। কাবেরী বলল, বি-এ পরীক্ষাটা দিতে পারতেন। মাসকয়েক যদি খাটি তা হ'লে পাশ করে যাব। কাবেরীও খাটে। আহ্ কি সুন্দর এই দোতলা বাসগুলো!

মাধবী বিছানা ছেড়ে উঠল। আজ অন্যদিনের থেকে শিগ্‌গির চিনু বাড়ি ফিরেছে। ভাত খেয়ে আবার বেরিয়েছে। সানু এখন ঘুমে কাদা। রমা সিনেমা দেখে ফেরেনি।

দিনেশের বিছানার ধারে মাধবী দাঁড়াল। দিনেশ এখনো ঘুমোয় নি।

—শরীর ক্লান্ত লাগছে বলছিলে কেন?

—বললুম না গঙ্গায় চান করেছি!

—হঠাৎ চান করতে গেলে কেন! এ বয়সে কি অনিয়ম সহ্য হয়?

—ইচ্ছে হ'ল কেমন যেন।

বিছানায় সরে গেল দিনেশ, মাধবীকে বসবার জায়গা করে দেবার জন্য।

—তারপর যদি অসুখ-বিসুখ হয় ?

—হবে না। অনেকদিন সাঁতার কাটি না, আজ কাটলুম।

—কেমন লাগল ?

—আমার বয়স বেড়েছে মাধু। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।

অন্ধকার ঘরটা যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেল দিনেশের গলার স্বরে। মাধবী ওর পায়ের ওপর হাত রাখল। জোয়ান বয়সে দিনেশ মাধু ব'লে ডাকত।

—চেষ্টা করলুম সাঁতরাতে আগের মতন। পারলুম না। ভেসে রইলুম। ভাসতে ভাসতে অনেকদূর গেলুম, তারপর খেয়াল হ'ল বাড়ি ফিরতে হবে।

—তাই বুঝি জল থেকে উঠলে !

—হ্যাঁ, এ বয়সে আর ভাসা যায় না। তাছাড়া রাতও হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোথায় ধাক্কা খাব শেষকালে। তাই ডাঙ্গায় উঠে পড়লুম।

—ভালই করেছ।

খসখস শব্দ হল। দিনেশের পায়ের চেটোয় মাধবী হাত বোলাচ্ছে। শব্দটা অন্ধকারকে চষে নরম করে দিচ্ছে। নরম অন্ধকারে দিনেশ টান-টান ক'রে পা ছড়িয়ে দিল।

—ওই গঙ্গাতেই বনমালী ডুবে মরেছিল। অথচ কি আশ্চর্য দেখ, যতক্ষণ জলে ছিলুম, সে কথাটা মনে পড়েনি।

—তাই তো নিয়ম। ছেলেমেয়েরা এ সংসারে ক'ত বুড়ো-বুড়ী দেখছে। তাই বলে কি তারা বয়সের কথা ভাবে !

—মাধু, ভাল করে উঠে বোস।

সরে গেল দিনেশ। দু' পা তুলে মাধবী বিছানায় গুছিয়ে বসল। দিনেশের পিঠে হাত রাখল।

—সেই কাটা দাগটা এখনো রয়েছে।

—আছে ! কি করে বুঝলে ?

—এই তো জায়গাটা কেমন তেলা।

মাধবী হাত বুলোল। শব্দ হল না। অন্ধকার জমাট বেঁধে রইল ওদের আশেপাশে।

—আমার খেয়াল ছিল না।

—আমারও।

—ও জায়গাটা আর তেলা থাকবে না। চামড়া ক্রমশই কুঁকড়ে আসছে।

—হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। আমরা দুজনেই হয়ে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, আমরা দুজনেই।

ঘরটা বড় হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার টানটান হয়ে উঠেছে। কাঁপছে।

—ছেলেমেয়েরা কি আমাদের কথা ভাবে?

দিনেশ চেপে ধরল মাধবীর আঙুল কটা। আঙুল কাঁপছে।

—জানি না।

—কেন, তুমিই তো বললে, এইটেই নিয়ম।

—অন্য কথা বলো।

—সেই ভাল। নিয়ম আমরা পাল্‌টাতে পারি না। অনেক জিনিস পাল্‌টান যায় না। আমাদের কথা মনে আছে?

—আছে।

মাধবী কাত হয়ে দিনেশের পাশে শুয়ে পড়ল। ওর মাথায় গাল রাখল দিনেশ। গালে হাত-রাখল মাধবী।

—তুমি দাড়ি কামাও নি।

—ছেলেমেয়েরা এখুনি ফিরবে।

—উঠে যাব?

—না না, আর একটু থাকো।

মাধবীর চুলে দিনেশ হাত বোলায়। শরীরটাকে আলগা ক'রে মাধবী শুয়ে থাকে। নিঃশ্বাস ফেলে দুজনেই জোরে জোরে। হঠাৎ একটা আরশুলা উড়ে আসে মাধবীর গায়ে। ধড়মড় ক'রে ওঠে সে।

—উঠো না। পরে মেরো'খন।

—তুমি ঘুমোতে পারবে না। তোমার ঘুম দরকার। নয়তো শরীর ম্যাজম্যাজ করবে, এতদিনের অনভ্যাস।

—পুরনো অভ্যাস কিছু কিছু আবার ঝালাই করা দরকার। পইতে

পুড়িয়ে ভগবান হয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। অফিসে কথা উঠেছে, ছাঁটাই হবে।

—তোমাকেও করবে?

—জানি না। অনেক পুরনো লোকওতো ছাঁটাই হয়!

—কি করবে?

—কি জানি। বুঝতে পারি না কি করব। দিনকালতো আগের মত নেই। ছেলে-ছোকরারা যা করবে, তাই করব। ওরা আমাদের থেকে বেশি বোঝে।

—হ্যাঁ, অনেক জিনিস আমরা এখনো বুঝি না।

—ওরাও এখনো অনেক কিছু বোঝে না। বয়স হলে বুঝবে।

—বয়স হলে অনেক কিছু লাভ হয়। আবার খোয়াও যায়।

—চিনু না বুঝে নিজেকে নষ্ট করছে।

—ওদের কথা ভাবলে ভয় করে।

—আমরা শুধু ভাবনা নিয়েই বেঁচে থাকব।

ঘরটা বড় হয়ে গেছে। অন্ধকারগুলো থিতিয়ে নেমে এসেছে। কড়ি-বরগার ঢাকনাটা খুলে যেন আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশ তারায় ভরতি। তারার আলোয় ওরা দুজন শুয়ে আছে। ওদের নিঃশ্বাসে কাঁপছে তারাগুলো।

—আমাদের আর বাড়ি করা হ'ল না।

—আর আমরা পারব না।

—ছেলেরা করবে।

—আজকাল গ্রামে খুব দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। মানুষ মরছে।

—আমি গ্রাম দেখিনি। কলকাতার বাইরেও যাইনি।

—আমাদের আর কোথাও যাবার উপায় নেই।

কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। ওরা কথা থামাল। কড়ি-বরগার ঢাকনাটা নেমে এল। দু'ফোঁটা আলোর বিন্দুর মত ওরা স্থির হয়ে রইল। আবার কড়া নাড়ল।

—বোধ হয় রমা এসেছে।

—তুমি এবার শুয়ে পড়।

—তুমি আর জেগে থেকো না।

—না। তুমিও।

—হ্যাঁ, আমিও।

চান করার পর সামান্য হাওয়াও গায়ে লাগলে হালকা লাগে নিজেকে। ফুটের ওপর পায়চারি করছে চিনু। রাত করে বাড়ি ফিরে খেয়েই ঘুম। ঘুমোলেই রাত কাবার। কিন্তু ঘুম আসার আগে পর্যন্ত সারাদিনের ঘাম আর ময়লায় চটচটে শরীরটাকে নিয়ে অস্বস্তি ভোগ করতে হয়। আজ চান করেছি। সকাল সকাল খেয়েছি। খাওয়ার পর পায়চারি করছি। নিজেকে হালকা লাগছে। অন্যদিনের থেকে আলাদা লাগছে। স্নায়ুগুলো ঢিলে হয়ে গেছে।

ফুটপাথে সারি দিয়ে ঘুমোচ্ছে অনেকগুলো মানুষ। দুধারে দুটো সারি। মাঝখানে চলবার পথ। চলতে গিয়ে একজনের পায়ে চিনুর পা বেধে গেল। লোকটার ঘুম তাতে একটুও চটকাল না।

সাবধানে হাঁটল চিনু। দাঁড়িয়ে মাথাগুলো গুনল; দু'সারিতে ত্রিশের কাছাকাছি। খালি গা, জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লোকগুলো অবাঙালী। কলকাতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। গতর খাটিয়ে রোজগার করে। রাস্তায় ঘুমোয়।

একটা মিষ্টির দোকান। দোকান বন্ধ হবে তাই ধোয়া মোছা চলছে। ফুটপাথে জল গড়াচ্ছে। পাশে পানের দোকান। খোলা। আবার ঘুমন্ত মানুষের সারি। চিনুর মনে পড়ল এইখানে সে দাঁড়িয়েছিল বুলগানিন খ্রুশেভকে দেখার জন্য। এ রাস্তা দিয়ে যাবার কথা থাকলেও সেদিন ওরা যায়নি। কয়েকঘণ্টা মিছিমিছি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ও পারের বাড়িটার বারান্দায় তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খুব সাজগোজ করা। তিন বোন মনে হয়েছিল। কিছুদিন আগে শোনা গেল—ওরা এক সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বোম্বে থেকে পুলিশ ওদের ধরে আনে। কালকেও ওদের দেখেছি সাজগোজ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

চিনু আর একটু এগোল। মানুষের সারি এখানে শেষ হয়েছে।

খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছে একজন। কোলে একটা বাচ্ছা। গোটা দশেক ছাগলও ঘুমোচ্ছে খাটিয়ার ধারে।

একটা রিক্‌শা থামল। সওয়ারি মাতাল। রিক্‌শাওলা সন্দেহ করছে, লোকটার কাছে যত পয়সা আছে তা'দিয়ে ভাড়াদেবার সামর্থ্য হয়ত হবে না। বিড়বিড় করে কি বলে লোকটা নেমে পড়ল। পকেট থেকে একমুঠো রেজগি বার করে রিক্‌শাওলার হাতে দিয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পয়সাগুলো গুনে পেট কাপড়ে বাঁধতে বাঁধতে চিনুকে দেখে শুধু শুধুই রিক্‌শাওলা হাসল।

—আস্তে ভাই।

ঝাঁটা চালান থামাল মিষ্টির দোকানের ছোকরাটা। রাস্তায় নেমে ফুট পাথটাকে এড়িয়ে গেল চিনু।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওকে। তাতেই মুখে বিরক্তির দাগ তুলেছিল। বোধহয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, তাই একটু তর'ও সইছিল না। আমার উচিত হয়নি একটুর জন্যও ওর কাজ থামান।

—ওম্মা, চিনুদা আকাশের দিকে তাকিয়ে কাকে খুঁজছেন?

চমকে উঠল চিনু। সিনেমা দেখে ওরা ফিরছে। রাস্তাটা পরিষ্কার। দূর থেকেই দেখা যায় কেউ হেঁটে এলো। অথচ সে দেখতে পায়নি।

—তোমাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলুম যাই খোঁজ করি।

—তাই বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে আকাশে আমাদের খুঁজছেন। খুব বাবা দরদ দেখালেন। ভয় নেই আপনার বোনকে নিয়ে পালাব না। এই নিন্।

রমাকে ঠেলা দিল আভা। সুবল হেসে উঠল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে আভার ভাইবোনেদের। ওরা হাঁটতে শুরু করল।

—চিনুদাকে বলেছিলুম আমাদের ওখানে যেতে, তা বুঝি আর মনে নেই। থাকবে কি ক'রে? বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা তাদের ফেলে কি আর আমাদের কথা মনে থাকে।

—বা রে, যার বাড়ি, যে কত্তা সে যদি না বলে তাহলে যাব কেন?

— আর গিন্নী বললেই যত দোষ। ওগো একবার যেতে বলতো। দেখি কেমন যায়।

—নিশ্চয় আসবেন।

—আর রমাকেও সঙ্গে করে আনবেন।

—আনবো।

সুবল বা আভা লেখাপড়া করে না। ওরা যা বলে তা অন্তর থেকে বলে। অন্তরের কথা শোনা মহাপুণ্য। এতদিন এমন কথা শুনিনি। মন স্নিগ্ধ হচ্ছে। আমি বললুম, ওদের বাড়ি যাব। এটাও আমার অন্তরের কথা। অন্তরের কথা বলাও মহাপুণ্য। ওরা আমার পুণ্য সঞ্চয়ের কারণ। ওরা মনের গ্লানি ধুইয়ে দেয়।

আভাদের বাড়ি আগে পড়ে। ওরা বাড়ি ঢুকে গেল। চিনু আর রমা নিজেদের পথ ধরল।

—কেমন দেখলি।

—ভাল।

রমা আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দিল। চিনুর এ ধরনের প্রশ্নে সে অভ্যস্ত নয়।

—যাবার সময়ও কি হেঁটে গেছলি?

—না, ট্যাক্সিতে।

—হেঁটেই যেতে পারতিস। মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট হ'ল।

—আমিতো বলেছিলুম। আভা শুনল না।

—খোঁড়াচ্ছিস কেন?

—জুতোটা ছোট হয়ে গেছে।

—জুতো কখনো ছোট হয়! হাঁটার অব্যেস নেই বলে এমন হয়েছে। বেরোতে পারিস তো। রোজ একবার পার্কটায় অন্তত চক্কোর দিয়ে আসবি।

বাড়িতে ওরা ঢুকল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রকটা এক জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। রমাকে হাতে ধ'রে জায়গাটা পার করে দিল চিনু।

—আজ কাবেরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—ও অনেকদিন আসে না।

—নার্স হবে বলে ট্রেনিং নিচ্ছে। হোস্টেলেই থাকে। তোকে একদিন নিয়ে যাব ওর কাছে।

এরপর কড়া নাড়ল চিনু।

ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ, উঠছে পড়ছে। ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাড়ির সব ঘরের সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটা বাড়িটাই ভারী ঠেকছে।

চুড়িকটা কনুইয়ের দিকে চেপে বসিয়ে পা-টিপে ঘর থেকে রমা বেরোল। দালানে দাঁড়িয়ে চোখে অন্ধকার সইয়ে দরজার খিল খুলল। সিঁড়িগুলো মুখস্থ। বিশ্বর ঘরের জানলায় পৌঁছল নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি একটিপ আগুন জ্বলছে। এক একবার উস্কে উঠেই বাসি রক্তের ছোপ ধরেছে। এ ঘরে বিশ্ব ছাড়া কেউ শোয় না। জানলায় হাত রেখে শব্দ করল রমা। কাঠের ওপর দিয়ে আরশুলা চলে বেড়ালে যতটুকু শব্দ হয়।

আগুনটা কিছুক্ষণ একভাবে রইল। নিভে গেল। সামান্য খসখস। জানলা জুড়ে বিশ্বর ছায়া পড়ল।

—এত রাত্রে, কি ব্যাপার!

—কিছু না, এমনি। ঘুম আসছে না।

—তাই ব'লে ওপরে কেন!

—ইচ্ছে হ'ল।

—নিজের ইচ্ছেমত সবসময় চলা যায় না। এখন যদি কেউ দেখে ফেলে?

—ফেলে ফেলবে। আমি বুঝব।

জানলা থেকে সরে গেল বিশ্ব। বেরিয়ে এল ছাদে। শক্ত মুঠোয় রমার হাত ধরে সিঁড়ি পর্যন্ত টেনে আনল।

—চলে যাও।

—কেন?

—হ্যাঁ।

—না যাব না।

—কেন যাবে না?

চুপ করে রইল রমা। হাত ছেড়ে দিল বিশ্ব।

—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

চুপ করে রইল বিশ্ব। রমা ওর হাত ধরল।

—কেন ? আমি কি দোষ করেছি ?

—কিছু না।

—তবে !

বিশ্বর হাতদুটো কাঁধের ওপর তুলে নিল রমা। একরাশ কাপড় ঝোলান দড়ির মত হয়ে রইল হাতদুটো।

—তুমি আমায় ভালবাস না রমা।

—কে বলল !

—কেউ না। না বললেও বুঝতে পারি। হিসেব ছাড়া কেউ চলে না। বলতে পার আমার কি আছে, কেন তুমি আমায় ভালবাসবে ? আমার চাকরিটাই কি তোমার ভালবাসাকে টেনে এনেছে ?

—চাকরি পাবার আগে থেকেই ভালবাসি।

—কিন্তু কেন ?

—জানি না।

—মিথ্যে কথা। শুধু শুধু এমনি ভালবাসা জন্মায় না। তুমি ব'ল ?

—বললুম তো জানি না।

—আমায় ভালবাসার কোন কারণ নেই। এখন আর সে সময় নেই যে চিরন্তন ভালবাসার নাম ক'রে, জীবনটাকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। তাহলে, কেন এ সময়ে তুমি এলে ?

—জানি না।

—তুমি আমায় জানোয়ার বলেছিলে।

ঝুঁকে পড়ল বিশ্ব। ওর নিঃশ্বাস রমার মুখে পড়ল। চুপ করে রইল যে।

—পেশাদার হতে চাও !

—তার মানে।

মুখ সরিয়ে পিছিয়ে গেল রমা। পিছনে দেয়াল। শব্দ হল। বিশ্বর হাতটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে আবার রমার কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরল। দাঁত দিয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে বিশ্ব কথা বলল।

—জানোয়ারের কাছে এসেছ কেন ? প্রেমের ব্রত পালন করতে ? বল, বল ?

ঝাঁকুনি দিল বিশ্ব। অস্ফুটে রমা কি যেন বলল। রাস্তা থেকে শব্দ এল। ভিজিলেন্স পার্টি লাঠি ঠুকে চলেছে। দোতলার নর্দমায় কেউ জল ঢালল। মা-মরা বেড়ালবাচ্ছাটা আবার ভয় পেয়েছে।

-- আমার লাগছে। ছেড়ে দাও।

বিশ্বর হাত ছাড়াতে রমা চেষ্টা করল। আরো জোরে ধরে রইল বিশ্ব।

-- ছাড়তে পারি, কথা দাও আমার সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক রাখবে না।

—না, কথা দেবো না।

– তোমায় বিয়ে করবো না, জেনে রেখ।

—কেন? তোমার কাছে এসেছি ব'লে?

--না, আমরা কেউ কাউকে ভালবাসি না ব'লে। আমাদের মন আর পরিষ্কার নেই। নিশ্চিন্তে সুখের জীবন, কোনরকমেই আর আমরা পাব না। নদীর মতন আমরা এঁকেবেঁকে এগোব। কোনদিনই দু'পার ছুঁতে পারব না। কি হবে বিয়ে ক'রে, সংসার পেতে!

বেড়াল কাঁদছে। ছাদের দরজার শিকলিটা হাওয়ায় খুটখুট করল। পায়রার বাসায় বোধহয় ইঁদুর ঢুকেছে। বড় রাস্তার গর্তে লরীর চাকা পড়ল। রমার কাঁধ থেকে হাত নামাল বিশ্ব। ওর আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল রমা।

— আমার বয়স ক'ত জান?

—এখন তা' দিয়ে কি হবে?

— জান, আভা আমারই বয়সী, ওর ঘর হয়েছে, ভালবাসার লোক হয়েছে, ও মা হবে!

ফিসফিস ক'রে বলা কথাগুলো বিশ্বকে ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পাক খে'ল। পাকিয়ে স্থির হয়ে রইল ওদের দুজনের মাঝে।

— তা'তে আমার কি?

—আমি পালাতে চাই। তুমি আমায় বিয়ে কর। না হ'লে কি ক'রে বাঁচব।

হঠাৎ জড়িয়ে ধরল রমা। গলা থেকে প্রাণপণে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল বিশ্ব।

—এমন করে বাঁচা যায় না। আর আমরা মিলতে পারব না।

আমাদের অনেক চাই, অনেক কিছু চাই। আমরা লোভী, স্বার্থপর হয়ে গেছি।

বুকের কাছে হাত ঠেকল। ঝটকা দিয়ে বিশ্ব সরিয়ে দিল। হাত দুটো আবার আঁকড়ে ধরতে এল। পিছিয়ে গেল বিশ্ব।

—নেমে যাও। নেমে যাও।

—তোমায় ভালবাসি।

ফিসফিসে কথাটা আবার পাকিয়ে উঠল ওদের মাঝে। কথাটাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যেই বিশ্ব হাতটা ছুঁড়ল। দাঁতে দাঁত ঠোকার শব্দ উঠল। দেয়ালে টলে পড়ল রমা।

—আমায় বাঁচতে দাও। তুমি আমায় মেরো না।

দু'হাত মেলে রমা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরল বিশ্বর পিঠ। জ্বালা করছে। ছাল উঠে গেছে। ঘাম গড়িয়ে নামছে। রমা ফোঁপাচ্ছে।

আলতো ক'রে কাঁধে হাত রাখল বিশ্ব। হাতটা কাঁধ বেয়ে গলায় উঠল। তুলতুল করছে মাংস। চাপ দিল। আঙুলগুলো ছড়িয়ে গলাটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে, মুঠোটা ছোট করতে শুরু করল।

শব্দ হচ্ছে। টিউব থেকে অল্প অল্প বাতাস সরু নল দিয়ে যেন বেরিয়ে আসছে। হাঁ ক'রে মুখ তুলল রমা। পিঠের হাত ঝুলে পড়ল। শব্দ করল মুখ দিয়ে। তারপরই বিশ্বর মুখে ঘুঁষি মারল।

আল্‌গা হয়ে গেছে মুঠোর চাপ। ঠোঁট চাটল বিশ্ব। নোনতা স্বাদ। ঘাম নামছে। জ্বালা করছে পিঠ। জোর নিঃশ্বাস পড়ছে। মুখটা যন্ত্রণায় ভোঁতা হয়ে গেছে। বেড়াল বাচ্ছাটা সমানে ডাকছে। খুটখুট শিকলি নড়ল।

হাত বাড়াল বিশ্ব। চুল, গাল, গলা, কাঁধ। টেনে আনল। নোনতা স্বাদ। রমার ঠোঁট কেটে গেছে। নোনতা স্বাদ। রমার গাল গলা কপাল ঘামে ভেজা।

শব্দ হল। টিউব থেকে যেন বাতাস বেরিয়ে আসছে। বিশ্বর চিবুকে লেগে খসখস করল রমার-চুল। মুখ তুলল। আবার নোনতা স্বাদ। বিশ্বর বুকে শব্দ ক'রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল রমা।

সেদিন কোন্ তারাটাকে দেখেছিলুম। সেটাকে এখন কি খুঁজে বার

করা যাবে! হারিয়ে গেছে। পৃথিবীতে অনেক মানুষ। আমিও হারিয়ে যাব। আমায় কি কেউ খুঁজবে?

তারাটা ছুটে গেল। ওটা উল্কা। ওটা কি সেই তারাটা। আমি কি অমন করে ছিট্‌কে পড়ব? যদি পড়ি কোথায় যাব! নরকে? আমি কি পাপ করেছি? যাদের অনেক আছে তারাই হিসেবী হয়। আমার কি আছে? বিশ্বর কি আছে? বুলাদের ঘরের বৌ হতে পারব না, কাবেরীর মত চাকরি করতে পারব না। কিন্তু ওদের মত আমারো মন আছে, শরীর আছে।

উল্কার মত আমি ছুটতে পারব না। ভয় করে। বিশ্বরও ভয় করে। ওই তারাগুলোর মধ্যে কোন্‌টে বিশ্ব! বুলা, কাবেরী, বাবা, মা, সানু ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। আমি এখন একা। এখন আমি সুখী। কিন্তু তারপর? তারপর কি আছে? ও হাঁপাচ্ছে। মরা ইঁদুরের মত মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। অমনি ক'রে কি আমরা ভবিষ্যতেও থাকব! ক্ষেপামির ক্লান্তি ঘুচবে কি দিয়ে? চিরজীবন এই ভাবে চলবে? আমরা যন্তর হয়ে যাব! আমরা মানুষ থাকব না।

—আঃ কেঁদ না।

রমার মাথায় হাত রাখল বিশ্ব। চুলে বিলি কেটে দিল।

—ওঠ, নিচে যাও, ঘুম পাচ্ছে।

রমা চুপ ক'রে রইল। শরীরে যন্ত্রণা, শরীরের মধ্যে যন্ত্রণা। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে শুয়ে রইল। এক সময় হাত রাখল বিশ্বর পিঠে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নিঃশব্দে রমা নিচে নেমে গেল।

॥ ছয় ॥

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই সানু বায়না ধরল গ্যাস বেলুনের। দিনেশ একটা কিনে দিতে মাধবী গা টিপল। হুঁশ হল দিনেশের। শৈল মুখ ঘুরিয়ে মানুষজন দেখতে শুরু করল আর তার দুই ছেলে ঘাড় তুলে দেখছে সানুর বেলুনটা। আরো দুটো বেলুন কিনে দিল দিনেশ।

—আয়রে শৈলী।

ওরা ফুটপাথ ধরে হাঁটা শুরু করল। তিনটে ছোট ছেলে বেলুন উড়িয়ে আগে তার পেছনে দিনেশ, আর একটু পিছিয়ে মাধবী, শৈল আর রমা।

—আজ কত লোক ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে বল্‌তো?

—কত?

শৈল ছেলে দুটোর ওপর নজর রাখতে রাখতে বলল। মাধবী যেন লোক গুনতে শুরু করেছে। কথা না বলে এধার-ওধার তাকাতে লাগল। রমা একটু জোরে হেঁটে দিনেশের পাশে এল।

—বাবা, কলকাতায় কত লোক থাকে?

—কেন?

—ব'ল না, এমনি জিগ্যেস করছি।

—পঞ্চাশ ষাট লাখ হবে।

সান্নুরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দিনেশ কাছে আসতেই সান্নু আঙুল দিয়ে দেখাল।

—বাবা, খাব।

—এই মাত্তর খেয়ে বেরিয়েছিস না?

শুধু একটা ধমকেই রমা চুপ করিয়ে দিল। রঙীন শরবতের গ্লাসগুলোর দিকে তাকিয়ে সান্নু তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—সান্নু, অসভ্যতা করলে মা'কে ব'লে দোব।

—আচ্ছা, পরে কিনে দোব।

দিনেশই শেষ পর্যন্ত সান্নুকে হাঁটাল। শৈলর ছেলে দুটি জুলজুল করে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল দিনেশের দিকে।

ওরা হেঁটে পৌঁছল একটা ছোট প্যাণ্ডেলে। পুরুষদের পথে দিনেশ ঢুকে গেল। সান্নুর বয়সী ছোট্ট একটা ভলান্টিয়ার ওকে সাবধান করে দিল, দড়িতে যেন হাত না দেয়। দিনেশ তার গাল টিপে দিতেই গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

বেলুন নিয়ে ওরা ঢুকেছিল। পাখায় লেগে শৈলর বড় ছেলেরটা ফেটে গেল। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে শান্ত হয়ে রইল।

ছোট্ট প্রতিমা। মামুলি ঢঙ। এক কাঠামোতেই সব কটা মূর্তি। আলোর বাহাদুরি নেই। ঝুড়ি-চুপড়ির কারচুপি নেই। এ্যাম্প্লিফায়ারে সিনেমার গান। তবু লোকের ভিড়।

ভক্তিভরে প্রণাম করল মাধবী আর শৈল। সিঁদুরের টিপ নিল। চরণামৃত ছেলেদেরও খাওয়াল। খুশি হয়ে ওরা বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

ওরা হাঁটল। পথে যতগুলো প্যাণ্ডেল পড়ল ওরা ঢুকল। প্রণাম করল। চরণামৃত খেল। সিঁদুরের টিপ পরল।

এক নাগাড়ে হাঁটা যায় না। রাস্তাপার হতে হবে। গাড়ি চলেছে। কলকাতার সবগাড়ি যেন একটা রাস্তা দিয়েই যাবে বলে ঠিক করেছে। হঠাৎ ব্যাজ-আঁটা একটা ছেলে বাঁশি বাজিয়ে রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়াল। গাড়ি চলা থামল। সকলে রাস্তা পার হল। ওরাও পার হল।

—শৈলী, তুই বড় টিকিয়ে হাঁটিস।

—কি কর'ব। অব্যেস নেই।

—রমা, আঁচল দিয়ে গলাটা ঢাক্। লোকটা তখন থেকে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে।

সরু একচিলতে হারটাকে রমা আঁচলে ঢাকল।

—বাচ্ছাগুলোর ওপর নজর রাখ।

—সন্ধিপূজো আরম্ভ হতে দেরী আছে।

—হ্যাঁ, সেই মাঝরাতে। দেখবি নাকি?

শৈল মাথা নাড়ল।

—না। উনি বাড়িতে একা। বাচ্ছাগুলো উঠে পড়লে সামলাতে পারবেন না।

মাধবী দিনেশকে ডাকল।

—কোন্ দিকে যাচ্ছ! গঙ্গার ধার দিয়ে চল না। এ রাস্তায় বড্ড ভিড়।

—এখনো তো বড় বড় গুলো দেখা হয়নি। কুমোরটুলি, আহিরীটোলা, বাগবাজার, তারপর ফায়ার-ব্রিগেড।

—তা হলে গঙ্গার ধার দিয়েই তো ভাল!

—অনেক ঘুরতে হবে।

—এ ভিড়ের চেয়ে তাই ভাল। বরং একটু জিরিয়ে নি। রমা ছেলে-গুলোকে ডাক্।

উবু হয়ে মাধবী ফুটের ধারে বসল। সানুর পায়ে ফোস্কা! জুতো খুলে ফেলল সে।

—কুলপী-বরফ খাবে?

মাধবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে দিনেশ বলল।

—এই খোলা রাস্তায়?

—কে আর দেখছে।

—ও শৈলী, বরফ খাবি?

—না দিদি।

মাধবী বুঝল শৈলর বাধাটা কোথায়।

—তুই না খেলে আমারও খাওয়া হবে না। কতদিন যে খাই না।

অপ্রতিভ হয়ে শৈল তাকিয়ে রইল। দিনেশকে ইশারা করল মাধবী।

রাস্তায় বসে ওরা বরফ খেল। হাঁটার অভ্যাস নেই কারুর, দিনেশ ছাড়া। উঠতে ইচ্ছে করছে না। হাঁটু ভেঙে আসছে।

—দিদি বাড়িতে উনি একা আছেন।

—আছে তো কি হবে। ওরা বেরোয়, বুঝুক একটু বাড়িতে বসে ছেলে আগলানোর মজাটা।

—ওর মন মেজাজ ভাল নেই।

—পুরুষ মানুষের এত অল্পেই ভেঙে পড়া ভাল নয়। তার ওপর তুইও জুটেছিস তেমনি।

কবে কার একটা তোলা তাঁতের শাড়ি শৈলর পরনে। হাতে শুধু লোহা আর প্ল্যাষ্টিকের চুড়ি। ওর তুলনায় মাধবীর সাজ স্বচ্ছল। তাই লজ্জা-পেল সে। শৈল ভেঙে পড়লে ওদের সংসারও পড়বে। ওর মনের জোর যাতে থাকে সেই কথাই বলতে হবে। অল্প বয়সে অনেকগুলো কুচোকাঁচার মা হয়ে ওর যন্ত্রণার শেষ নেই। আহা, ভালয়-ভালয় সবগুলো মানুষ হোক্।

ফেরার সময় রিক্‌শা কোরো।

দিনেশকে মুখ আড়াল করে মাধবী বলল।

—দুটো হলেই হয়ে যাবে। শৈলীটা একদম হাঁপিয়ে গেছে।

—ওকে না আনলেই হোত।

—বাঃ পুজোয় বেরোবে না? বচ্ছরকার একটা দিন! বাড়ির মধ্যে বসে থাকবে?

একদল অবাঙালী মেয়ে-পুরুষ বরফ খেতে বসল ওদের পাশেই। মাধবীর গা টিপল শৈল। একটা জোয়ান তার কচি বৌকে হাতে করে বরফ খাওয়াচ্ছে। হাসল ওরা সকলেই।

রমা চারদিকে তাকাচ্ছে। বিশ্বকে বলা ছিল তারা রাত্রে বেরোবে। বিশ্ব বলেছিল রাস্তায় দেখা করবে। এতক্ষণেও দেখা হয়নি। এমন করে বসে থাকতে বিশ্রী লাগল রমার! হয় তো একটু এগোলেই দেখা হয়ে যেতে পারে।

—এমনি করে বসেই থাকবে?

—আর একটুখানি।

মাধবীর মজা লাগছে কচি বৌটা আর তার জোয়ান স্বামীর হাবভাবে। তাড়া দিল দিনেশ।

—এখনো তো বড় প্রতিমাগুলো দেখা হয় নি। যত দেরী করবে ততই ভিড় বাড়বে।

বাচ্ছা তিনটের হাই উঠছে। সানু জুতো জোড়া রাস্তায় ফেলে রেখেছে। হাতে তুলে রাখল রমা। একটা ছেলে ঢুলছে। তাকে কোলে নিল শৈল।

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। পথে ছোট ছোট প্যাণ্ডেল পড়ল। মানুষের ভিড়ে জমজমাট। ওরা থামল না। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে ওরা হাঁটছে। তাঁবু খাটিয়ে ম্যাজিক দেখান হচ্ছে। আগুনে মানুষ। লোকটা যা ছোঁবে তাইতেই আগুন ধরে যাবে। ওদের হাঁটার বেগ কমে এল। দিনেশ এগিয়ে গেল বলতে বলতে।

—এখানে থেমো না। এখনো অনেক দেখার বাকি।

আবার জোরে হাঁটতে শুরু করল। সাহুর বেলুনটা হঠাৎ হাত ফসকে উড়ে গেল। ওরা দাঁড়িয়ে দেখল। হেলে দুলে বেলুনটা উঠে যাচ্ছে।

—দাঁড়িয়ে থেকো না। অমন কত বেলুন আজ উড়বে, ফাটবে।

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। এখানে আর্টের ঠাকুর। কেমন শোলা-শোলা ঠেকছে। কাঠেরও হতে পারে। না মাটিরই বোধ হয়। কি দরকার এত খেটে-খুটে পয়সা খরচ করে তৈরী করার। বিসর্জন তো দিতে হবেই। কিন্তু চোখ জুড়োয়। একঘেয়ে ঢঙ দেখে দেখে আলুনি লাগছিল। রোজকার দেখা রান্না ঘরটার মত। এই ভাল। রঙ দেখলে চোখ জুড়োয়। নতুন ঢঙ্। এই বেশ।

—হাঁটো হাঁটো, থেমো না। দিনেশ কেমন মানুষের ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে যাচ্ছে। যাবেই তো। পুরুষমানুষ, রাস্তায় চলার অভ্যাস আছে যে।

—শৈলী, ওই গাড়িটার দিকে তাকা। বৌটাকে গয়না পরিয়েছে কেমন। বেচারা! নিশ্চিন্তি হয়ে গাড়ি থেকে নামবে কি করে!

রাস্তা পড়েছে। ওরা দাঁড়াল। চারদিক থেকে মানুষ আসছে। এই মানুষের ধাক্কা সামলাতে হবে। গাড়ি দেখে পার হতে হবে। শৈল ঘুমন্ত ছেলের ভারে বেঁকে পড়েছে।

—অ শৈলী, ছেলেটাকে দে।

—না দিদি, পারব।

—না পারবি না। রমা ওকে কোলে নে।

চটকা লেগে ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। রমার কোলে কাঁদতে শুরু করল।

—ওগো, এখানে বট্‌ঠাকুর-ঝির ভ্যাওরের বাড়ি না?

—না, এখানে নয়, কম্বুলিটোলায়। সে এখান থেকে অনেক দূর।

—কত নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে, দেখেছ?

—আমি আর কি দেখব, তুমি দেখ।

—এখানে বাড়ির ভাড়া ক'ত করে?

—অনেক।

—অ দিদি ছেলেগুলো কোথা ?

—তাই'ত রে শৈলী !

ওরা দাঁড়াল। আগে আগে যাচ্ছিল ছুটো ছেলে।

—তোমরা এখানে দাঁড়াও আমি দেখি।

দিনেশ ভিড়ে ঢুকে পড়ল। এখান থেকেই ভিড় শুরু হয়েছে। রাস্তাটা খুব চওড়া নয়। মানুষ অজস্র। তাই ছু'পা হাঁটলেই আর দেখা যায় না। একবার ভিড়ে মিশলে উল্টোদিকে ফিরে আসা ছুঃসাধ্য। ঠেলতে ঠেলতে সেই প্যাণ্ডেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। ছেলে ছুটো যদি ভিড়ের মুখে পড়ে তাহলে আর ফিরতে পারবে না।

একটু পরেই ফিরল দিনেশ মুখ শুকনো। চাউনিটা বেঠিক।

—ওরা আসেনি ?

—কই না তো !

—দিদি কি হবে !

—কি আর হবে, খোঁজ করতে হবে। প্যাণ্ডেলের ভেতর অফিস, সেখানে গিয়ে বলতে হবে। ওরা মাইকে বলে দেবে। সাতুটাতো পড়তে পারে, চিনে চিনে ঠিক অফিসে হাজির হতে পারবে।

—তাহলে দেরী করে লাভ কি। হয়তো ওরাও আমাদের খুঁজতে, কোথায় ছিটকে পড়বে !

ওরা ভিড়ের দিকে এগোল। ঝুরঝুর মানুষ প্রথমটায়। যত এগোয় মানুষ জমাট হচ্ছে। প্যাণ্ডেলের গেট অনেকদূরে, তবু মানুষ চাপ বাঁধছে। এই চাপটা এগোবে। গেটের মুখে ভলান্টিয়ার দড়ি আর বাঁশি বাজিয়ে চাপটাকে আটকাচ্ছে। খণ্ড করছে। এক একটা খণ্ড ভেতরে ঢুকবে। আবার দড়ি পড়বে। ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ততক্ষণে পিছনে মানুষ জমেছে। সামনে পিছনে ছুদিক থেকে ঠেলা আসছে। মানুষ হাঁপসাচ্ছে। ঠেলা খেয়ে চাপটা ছুলছে। টলে টলে উঠছে। ওরই মধ্যে প্রতেকটা মানুষ চেষ্টা করছে স্বস্তিতে থাকবার। হাত তুলে সামনের মানুষটাকে ঠেলে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করতে চাপ দিচ্ছে। সব মানুষই নিজের সুবিধের জন্য চাপছে। একটা বিরাট চাপ তৈরী হচ্ছে।

হঠাৎ দড়িটা খুলল। হুড়মুড় করে একটা খণ্ড ভিতরে ঢুকে গেল। খানিকটা জায়গা ফাঁকা হল। ফাঁকা জায়গার লোভে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই।

ছেলে কোলে রমা টলে পড়ল। ওকে আঁকড়ে ধরল শৈল।

—দিদি এমন করে চললে রাত কাবার হয়ে যাবে। বাড়িতে উনি একা।

—তা'বলে ছেলে দুটোকে ফেলে রেখে যাবি নাকি!

বিরক্ত হয়ে ধমকাল মাধবী। দিনেশ বুকের কাছে হাত জড়ো করে সামনের মানুষকে ঠেলছে।

—ভুলপথে এসেছি। মেয়েদের ঢোকার রাস্তা এদিকে নয়।

—এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি। আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।

মাধবীকে ঠেলছে পেছন থেকে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটা পুরুষ মানুষ। দু'হাতে মাধবীর কাঁধ ধরেছে। চোখাচোখি হতে কেমন করে তাকাল। হাতটা নামিয়ে নেবার জায়গাও নেই। ধরুক! এখন আর অন্য কিছু ভাবার ফুরসতও নেই।

ভিড় চাপ খাচ্ছে। রমার কোলে ছেলেটা কান্না ভুলেছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পিঠের আঁচল খসে পড়েছে। ব্লাউজটা উঠে গিয়ে কোমর বেরিয়ে পড়েছে। পড়ুক, হাত নাড়াবার জায়গা নেই। এই ভিড়ে কেউ এখন তাকাবে না।

কে চেঁচিয়ে উঠল। গলার হার কেটেছে। রাস্তার ধারে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কে যেন। অজ্ঞান হয়ে গেছে। দিনেশকে মাধবী বলল।

—আমাদের না আসাই উচিত ছিল। বুড়োরা কি পারে এই ধকল সামলাতে।

—আমরা কি ইচ্ছে করে এসেছি। ছেলেদের জন্যই তো আসতে হল।

দূরে সরে গেছে শৈল। তিন চার পরত মানুষের ব্যবধান। কাছে আসার জন্য ভিড় ঠেলছে। মানুষের চাপে আঁচল আটকে গেছে। নিজের

শরীরটাকেই ও ঝাঁকুনি দিল। ভিড় আলগা হ'ল না। চেঁচিয়ে ডাকল শৈল। মাধবী, দিনেশ, রমা মুখ ফেরাল।

হঠাৎ সামনের ভিড়টা পাতলা হল। বোধ হয় দড়ি উঠেছে। পেছনের ধাক্কায় মানুষগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। টাল সামলাতে পারেনি দিনেশ। পড়ে গেল।

হুড়মুড়িয়ে ভিড় আসছে। পায়ে পায়ে চটকে দিয়ে যাবে দিনেশকে। চীৎকার করে মাধবী ভিড় আটকাতে গেল। ঝুঁকে পড়ল দিনেশকে তোলবার জন্য। পেছনের লোকটা শক্ত খোঁটার মত ভিড় রুখতে চেষ্টা করল। নড়বড় করে দুলছে মানুষটা। এখুনি ভেঙে পড়বে।

হঠাৎ শৈল ক্ষেপে উঠল। কোন রকমে পা তুলে হাঁটু দিয়ে সামনের লোকটার কোমরে চাড় দিল। নিঙড়ে গেল যেন মাংস। একটু জায়গা হয়েছে হাত খেলাবার মত। দু হাতে এলোপাথাড়ি ঘুষি ছুঁড়ল শৈল।

—দিদি টেনে তোল।

শৈল চীৎকার করল।

—পড়ে গেছে। হাত তুলে থামতে বলুন। ভিড়কে থামতে বলুন।

কে যেন চীৎকার করে হাত তুলল। কে শুনবে, একটা মানুষের কথা। যেমন করেই হোক মানুষ আগে পৌঁছতে চায়। ওই প্যাণ্ডেলের গেটটুকু পেরোলেই রেহাই। তারপর রঙ-বেরঙের আলোর সাজান দোকান। হরেক রকমের জিনিস। বিচিত্র মানুষ। দোকানে দোকানে হাতে ক'রে জিনিস নাড়াচাড়া, দরদাম, সাধাসাধি।

—এখানে একটা মানুষ পড়ে গেছে।

একটা লোক তার পাশের লোককে বলল। পেছনের লোকও শুনল। ওরা কজন শক্ত হয়ে পেছনের ভিড় রুখল।

—কি হয়েছে এগোচ্ছেন না কেন ?

—একটা লোক পড়ে গেছে।

—একটা লোক পড়ে গেছে ?

ওরা পেছনে চাপ দিল। পেছনের মানুষ এগোতে চাইল। বিরক্ত হল। রেগে উঠল।

—একটা লোক পড়ে গেছে।

মানুষের বিরাট চাপ থমকে গেল। রেগে উঠল।

ছিঁড়ে গেল শৈলর এতদিনকার তোলা শাড়িটা। ঘড়ির স্টীলের ব্যাণ্ডে কনুই ছড়ে গেছে। মুখে রক্ত জমেছে। হাতের লোহা তুবড়ে বসে গেছে। পা মাড়িয়ে দিয়েছে কার জুতোর গোড়ালি। পাঞ্জাবি আর সার্টের হাতা, আঁকড়ে টেনে ধরে, ফাঁক দিয়ে গলে এল শৈল।

দিনেশকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কারা। ভিড় আবার চলেছে একটু একটু। ঝুঁটি-ভাঙা পায়রার মত লটকাচ্ছে দিনেশের মাথা। ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল শৈল।

—দিদি তুমি সামনে যাও।

মাধবীর হাত ধরে শৈল ঠেলে দিল।

—রমা, ইদিকটায় আয়। খোকাকে কোল ফিরিয়ে আমার দিকে রাখ।

শৈল দু'হাতে রমা আর দিনেশকে ঘিরে রাখল। মাধবী ওদের দুজনের সামনে রইল।

—ঠেলছেন কেন?

পাশের মানুষটাকে রুখে উঠল শৈল।

—ইচ্ছে করে কি ঠেলছি।

সমান রুখে জবাব এল। মাধবী বলল :

—আর পারা যায় না।

—এই তো এসে গেছি। গেট দেখা যাচ্ছে। ছেলে দুটোর এই ভিড়ে কি যে হয়েছে কে জানে।

—ওরা কি পারবে আমাদের মত সহ্য করতে।

—পেরেছে নিশ্চয়, নইলে হৈ-চৈ হ'ত। একটা কিছু জানতে পারতুম।

শৈল হাঁপাচ্ছে। তবু শান্ত স্বরে কথা বলল। কেউ যেন না ভয় পায়, তাই নিজের ব্যস্ততা দেখাল না। এদের তিনজন আর নিজের ছেলেটাকে সামলে এগোতে হচ্ছে। রাস্তায় খোয়া উঠেছে। জলের পাইপ বসাবার জন্য খুঁড়েছিল বোধ হয়। পায়ে ফুটছে। পেছন থেকে জুতোর ঠোকর

লাগল গোড়ালিতে। এমন ভিড়ে লাগবেই। তার জন্য ঝগড়া করে লাভ নেই। যে করে হোক এগিয়ে যেতে হবে। দিনেশ আর মাধবীর বয়স হয়েছে, ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রমাটা আনকোরা। ঘাবড়ে গেছে। খোকার যেন কষ্ট না হয়। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা এখনো ওর হয়নি। ওদের সামলে এগোতে হচ্ছে শৈলকে।

পৌঁছে গেছে। একটা খণ্ড ভেঙে বেরিয়ে যেতেই ওরা দড়ির সামনে পৌঁছে গেল। ওপাশ দিয়ে আর একদল মানুষ আসছে। ওরা প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়েছে। ওদের যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাঁশিতে ফুঁ পড়বে। দড়ি ঘুরে ওপাশে যাবে। ওরা আটকা পড়বে। এরা তখন ছাড়া পাবে।

অপেক্ষা করছে এরা। সামনে দিয়ে ভিড় চলেছে। কথা বলছে। হাতে হাত দিয়ে ছুটছে। আর এক প্যাণ্ডেলে। সেখানেও হয়তো এমন ভিড়। আজ সারারাত ওরা এমনি করে ভিড় ঠেলবে।

—মানুষ এতও পারে।

রমা বলল কথাটা। ও এমন ভিড় আগে দেখেনি।

—এই বেশ লাগে। মানুষ চলছে ফিরছে, ওদের চলা দেখতে বেশ লাগে।

দু হাতে ভর দিয়ে শরীরটা হেলিয়ে বসল চিনু। কাবেরী রাস্তার দিকে তাকিয়ে। পার্কের এই দিকটা অন্ধকার। থোকো থোকো মানুষ বসে আছে। জিরোতে এসেছে। আবার উঠে যাবে।

চিনু বা কাবেরী ক্লান্ত নয়। মানুষের ভিড় এড়িয়ে ওরা বসেছে সময় কাটাতে। ঘুরে বেড়াতে ওদের ভাল লাগছে না।

—তোমার ফিরতে দেরি হলে কিছু হবে না ত ?

—না। সাড়ে ন'টার পর হলে সই করে ঢুকতে হবে।

কিছুটা ঘাস ছিঁড়ল কাবেরী। লুকোচুরি খেলতে খেলতে দুটো বাচ্চা তাদের ঘিরে নাচানাচি শুরু করল। ওপাশ থেকে ডাকল ওদের মা। মস্ত পার্ক। মধ্যে আলো নেই। তাই অন্ধকার মাঝখানটা। বাচ্চা দুটো নিজের মনেই হারিয়ে যেতে পারে। ওদের মা উঠে এসে ধরে নিয়ে গেল।

—কেমন লাগছে বলতো ?

—বেশ লাগছে।

আবার ঘাস ছিঁড়ল কাবেরী। রাস্তা কমাবার জন্য অনেকে কোণাকুণি পার্কের মধ্যদিয়ে চলেছে। ধমকাচ্ছে একজন তার বৌকে নিড়বিড়িয়ে হাঁটার জন্য। খলবল করে গেল কতকগুলো মেয়ে। কাঁধে হাত রেখে ছেলেটি কি যেন বলল মেয়েটিকে। ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রাস্তা থেকে একঝাঁক বেলুন ছেড়ে দিয়েছে কে।

—কাল সকাল সাতটায় ডিউটি।

কাবেরী ঘাস ছেঁড়া বন্ধ করে বেলুন দেখতে লাগল।

—তোমার দিদির কাছে ছুটির দিন তো আসতে পার।

—আসব। দু'হাতে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ল চিনু। মিষ্টি গন্ধ আসছে। কাবেরী কিছু একটা মেখেছে। উঁচু করে খোঁপাবাঁধা। গঙ্গামাটির মত ঘাড়। ঘাড় ফেরাল। ছলকে উঠল মাংস। গলায় সরু সরু দাগ। থুতনির নীচে একটু পল-তোলা। হাতের চেটোয় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল চিনু।

—সারারাত এমনি করে এখানে বসে থাকা যায়, না ?

—ঘুম পেয়ে যাবে। কেমন একটা না একটা শব্দ হচ্ছে যেন ট্রেনে চেপেছি। আপনার ঘুম পায় না ট্রেনে উঠলে ?

—ঘুমোবার মত জার্নি কখনো করিনি।

—আপনি ভয়ানক কুঁড়ে।

—কিসে বুঝলে !

—আমি বসে রয়েছি অথচ শুয়ে পড়লেন।

—তাতে কি প্রমাণ হয় আমি কুঁড়ে ?

—নিশ্চয় হয়।

সময়-কাটানো তর্ক একটা তৈরী হবার মুখে, এমন সময় জনাছয়েক ওদের কাছেই গোল হয়ে বসে হৈ-চৈ শুরু করল। ওদের পরনে সরু চোঙার মত প্যাণ্ট। নাইয়ের নীচ দিয়ে বেল্ট। ক'জনের মাথায় বেতের টুপি। হাতে হুঁকো। ওরা মানুষকে মজা দিতে বেরিয়েছে।

চুপ করে গেল চিনু। জায়গাটা এতক্ষণ নিরিবিলি ছিল। কয়েকজন এদিকে তাকিয়ে কি ফিসফিস করল। হেসে উঠল সবাই ভীষণ জোরে। পার্কের অনেকেই তা'তে মুখ ফিরিয়ে দেখল। অস্বস্তি হচ্ছে। চিনু উঠে বসল।

—হঠাৎ কেমন গরম পড়েছে। ক'দিন ধরে।

—হ্যাঁ, গুমোট গুমোট ভাব।

—বৃষ্টি হবে কি ?

—মেঘ কই !

ওরা মেঘ খুঁজতে লাগল। হৈ-চৈ করছে ছেলেগুলো। গান ধরেছে একজন। গলাটা মিষ্টি। হাত তালি দিচ্ছে সকলে। হঠাৎ একজন লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। হাত ধরে, কোমর ভেঙে, ঘাড় নাড়া দিয়ে নাচছে। কে একজন হুঁকোটা হাতে তুলে দিল।

—আপনার ক্ষিদে পায়নি ?

—না, তোমার পেয়েছে ?

—হ্যাঁ, সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছি।

—তাহলে ওঠো।

ওরা উঠে পড়ল। দেখে দেখে খুপরিওলা একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকল। দোকানের বাচ্ছাটা চিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। চিনু তাকাল কাবেরীর দিকে।

—কি খাবে ?

—যা হোক।

—তবু ?

—খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

—তাহাল মাংস আর পরোটা।

খাওয়ার পর বিল নিয়ে এল বাচ্ছাটা। মৌরির প্লেটে বিলটা রাখল চিনুর সামনে। বিলটা তুলে নিয়ে সে পড়তে শুরু করল। বাচ্ছাটা দাঁড়িয়ে। দোকানে আজ অনেক খদ্দের। একজায়গায় আটকা থাকলে চলবে না। উশখুশ করল সে।

চিনু তাকাল কাবেরীর দিকে। বাচ্ছাটাকে এক গ্লাশ জল আনতে পাঠাল কাবেরী।

—কত হয়েছে ?

—দু টাকা চার আনা।

ছোট্ট ব্যাগটা থেকে তিনটে টাকা বার করল কাবেরী বাচ্ছাটা আসার আগেই। রাস্তায় বেরিয়ে খুচরোগুলো ফেরত দিচ্ছিল চিনু। কাবেরী নিল না।

—এরপর কিন্তু সিগারেট খেতে দেবো না। গন্ধটা আমার বিচ্ছিরি লাগে। খাবেন তো এখানেই খেয়ে নিন্।

অর্থহীন কথা। কথা না বাড়িয়ে পয়সাগুলো পকেটে রাখল চিনু। আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে তালগোল পাকাচ্ছে একরাশ নিঃশ্বাস।

—কোন্ দিকে যাবেন ?

—যেদিকে হয়।

সামনের দিকেই হাঁটতে শুরু করল। উল্টোদিক থেকে মানুষ আসছে। পথ ছেড়ে দেবার জন্য কখনো ওরা ঘেঁষে এল, কখনো দূরে সরে গেল। রাস্তা পার হবার জন্য পাশাপাশি দাঁড়াল। কথা না বলে ওরা হাঁটছিল। হঠাৎ চিনু বলল ঃ

—একটা চাকরির চেষ্টা করেছিলুম স্টেট বাসে, হোল না।

—কেন ?

—আর লোক নিচ্ছে না।

—অন্য কোথাও ?

—খুঁজছি।

—অবস্থা খুব খারাপ, চাকরির।

—আরো খারাপ হবে।

ওরা দাঁড়াল। ডানদিকের রাস্তায় খুব ভিড়। রাস্তাটা একটা প্যাণ্ডেলে পৌঁছেছে।

—যাবেন ?

—ভিড় দেখেছ ?

—দেখেছি, তা'তে কি হয়েছে।

ভীষণ ঠেলাঠেলি করতে হবে। কষ্ট হবে তোমার।

—তাহলে কি করব। পার্কে বসে থাকব !

—আচ্ছা চল। ওদিক দিয়ে এস, মেয়েদের রাস্তা ওদিকে।

—একা একা ঘুরতে আমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু পুরুষদের দিকের অবস্থা দেখেছ ?

—আমার যে দু'একটা জিনিস কিনতে হবে !

—কিনবে।

—আমি দরদাম করতে পারি না। সব সময় ঠকে যাই।

—আমার জিনিস কেনা অব্যেস নেই। এদিকে সরে এস।

ওরা ফুটপাতে উঠে দাঁড়াল। দুজনেই তাকাল ভিড়ের দিকে। নির্ঝঞ্ঝাটে দাঁড়াবার জো নেই। ধাক্কা দিয়ে মানুষ চলেছে।

—একটা বেড-কভার কিনতে হবে।

—ভিড় দেখেছ, যাবে ?

—চলুন না।

—চল।

ওরা গুটিগুটি এগিয়ে এল ভিড়ের দিকে। পাতলা ঝুরঝুরে প্রথমটায়। যত এগোয় মানুষ জমাট হচ্ছে। প্যাণ্ডেলের গেট অনেকদূরে, তবু মানুষ চাপ বাঁধছে।

—এই তো সবে শুরু।

—হ্যাঁ, সবে শুরু।

কি একটা ঠেকল চিনুর হাতে। হাতটা সরিয়ে নিচ্ছিল। কাবেরী টেনে ধরে ব্যাগটা গুঁজে দিল।

—রাখুন। আমি দরদাম করতে পারি না।

—এবার বোধ হয় ছাড়া পাব।

দড়িটা ওদের বুকের কাছে কাঁপছে। টুলের ওপর বাঁশি মুখে দিয়ে দাঁড়ান ভলান্টিয়ারটির দিকে সকলেই তাকিয়ে। সে ভুরু কুঁচকে মানুষ মাপছে। হিসেব কষছে, বাঁশিতে ফুঁ দেবার সময় হয়েছে কি না।

—পৌঁছে গেলুম।

আবার বলল দিনেশ। তাকাল সে মাধবীর দিকে। ঘোমটা তুলে দিল মাধবী।

—ছেলে ছুটোর জন্যই যত কাণ্ড।

—হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে কি থাকতে দেয়। এখন আবার ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ছোটাছুটি করতে হবে।

বাঁশিতে ছুবার ফুঁ পড়ল। তার মানে দড়ি-ধরা ভলান্টিয়াররা তৈরী হও, দড়ি সরাতে হবে। বড় ফুঁ পড়লেই দড়ি সরবে। আটকান মানুষগুলো ছাড়া পাবে। হঠাৎ ওই জায়গার মানুষগুলোর শব্দ কমে গেল। নিঃশ্বাস চেপে দাঁড়িয়েছে সকলে।

—ছেলেটাকে আমার কোলে এবার দাও।

রমার কাছ থেকে ছেলেকে তুলে নিল শৈল। রমা পিছু ফিরে একবার তাকাল। বিশ্ব বলেছিল দেখা করবে রাস্তায়। দেখা হয় নি।

—এতক্ষণ বুকে একটা ব্যথা করছিল। অভ্যাস নেই তো। সেদিনও করেছিল, সাঁতার কাটার পর।

—করবেই তো, কম খাটুনির ব্যাপার!

—ছেলে ছুটো বোধ হয় ভেতরে মজাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—না, বোধ হয়। কাঁদছে। হয় তো আমাদের দেখতে না পেয়ে কাঁদছে।